গামহারডুংরী

বুদ্ধদেব গুহ

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা ৭৩

গ্রন্থালয় সংস্করণ ঃ
২৭শে আষাঢ় ১৩৭২

প্রকাশক ঃ
আনন্দরূপ চক্রবর্তী
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

প্রচ্ছদ ঃ
রূপায়ণ
কলকাতা-৫

মুদ্রাকর ঃ
দুলালচন্দ্র ভুঞা
৪/১এ সনাতন শীল লেন
কলকাতা-১২

গামহারডুংরী

একটু আগে খুব জোর একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বর্ষাকালে তো বৃষ্টি হবেই। তবে এখনও শ্রাবণ আসেনি। আষাঢ়েই এমন বাড়াবাড়ি ভাবা যায় না। রাঁচীতে যখন থাকত ঋষি তখন বৃষ্টিকে ঠিক এই চোখে দেখত না। বৃষ্টি এলে, ভালো ঠিকই লাগত। কিন্তু এমন আনন্দ হত না। তমালদা তার এই জঙ্গুলে আস্তানাতে ডেকে নেবার পর তাঁর এই সবুজায়নের প্রয়াসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে ঋদ্ধি। ঋদ্ধি একাই নয় আরও কয়েকজন ছেলে-মেয়ে আছে। সুদূর রাঁচী থেকেই নয়, তারা এসেছে ভারতের নানা জায়গা থেকে।

বৃষ্টি যে প্রাণদায়িনী তা এই হাজার হাজার গাছের তরতরিয়ে বেড়ে ওঠার সাক্ষী হিসেবে সে প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করেছে। এতদিন গাছকে গাছ বলেই জেনে এসেছিল; গাছও যে প্রাণী, তাদেরও যে সুখ-দুঃখ বাঁচা-মরা আছে, তারাও যে ভালোবাসা এবং ভালোবাসার অভাব বুঝতে পারে, সে কথা আগে সত্যিই জানত না।

এ মাসের গোড়াতে একবার কলকাতাতে গেছিল। অরণ্য সপ্তাহ চলছে এখন সেখানে এবং পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই। বিনিপয়সাতে গাছের চারা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু শহুরে মানুষের কাছে গাছের ভূমিকা সম্ভবত এখনও স্পষ্ট নয়। গাছের ভূমিকা সম্বন্ধে ওঁরা হয়তো অবহিত হবেন এই সুন্দর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবার পরে।

এটা গভীর দুঃখের।

পশ্চিমবঙ্গের বনবিভাগ এবারে একটি স্লোগান, পোস্টারে পোস্টারে সারা শহরে ছড়িয়ে দিয়েছেন। ভারি পছন্দ হয়েছিল ঋদ্ধির

সেই স্লোগানটি। কয়েকটি পোস্টার বনবিভাগের অরণ্যভবনের অফিস থেকে চেয়ে নিয়ে এসে ওদের গামহারডুংরীর অফিসের দেওয়ালে টাঙিয়ে দিয়েছেও।

"গাছ বাঁচালে বাঁচবে তুমি
বন বাঁচালে সুখ,
সবুজে সবুজ হোক বাংলার মুখ।"

গামহারডুংরীর মানুষেরা অধিকাংশই মুন্ডা এবং মুন্ডারি ভাষাতেই কথা বলে তবে রাঁচী, চাঁইবাসা এমনকী কলকাতা থেকেও অনেক পর্যটক এখানে আসেন। গামহারডুংরীর নাম জামশেদপুরের কমল চক্রবর্তীর বান্দোয়ানের 'ভালো পাহাড়ের'ই মতো ছড়িয়ে পড়েছে। তমালদা প্রায়ই বলে যে, কমলদা যে কাজ করেছেন সে জন্যে তাঁর ম্যাগসাইসাই পুরস্কার এবং দেশীয় নানা পুরস্কারও পাওয়া উচিত। হয়তো তমালদারও পাওয়া উচিত। সে কথাটা ঋদ্ধিরা বলে। রাজনৈতিক রং না থাকলে এবং লোকদেখানো ভড়ংবাজি না থাকলে এইসব পুরস্কার পাওয়া যায় না। এসব অ্যাক্টিভিস্টসদের সঙ্গে ভালোপাহাড়ের কমলদা অথব গামহারডুংরীর তমালদার কোনোই মিল নেই। এঁরা লোকচক্ষুর আড়ালে নিজের নিজের বিশ্বাসকে, রুক্ষ, কঠিন, লালমাটির বহিরাবরণকে বিদ্ধ করে গাছের মতো প্রোথিত করে তাতে নিয়ত জলসিঞ্চন করছেন। এরা প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রচার পাওয়ার জন্যে, বা রাতারাতি ঈশ্বর-ঈশ্বরী হয়ে ওঠার জন্যে এই সবুজায়নে নিজেদের নিয়োজিত করেননি। দেশের এই বিশেষ সংকটের সময়ে দেশকে বাঁচানোর প্রচারহীন সংকল্প নিয়ে নিজেদের ধন-প্রাণ এমন করে নিঃশেষে নিবেদন করেছেন। যাঁরা জানেন, তাঁরাই জানেন।

ঋদ্ধির মতো একাধিক শিক্ষিত ছেলেমেয়ে অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যই যে মানুষ হওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য নয় এই সত্যটি

আবিষ্কার করেছে তমালদার গামহারডুংরীর এই নীরব আন্দোলনের শরিক হয়ে। এখানে এসে ওরা জীবনের মানে খুঁজে পেয়েছে। এই আবিষ্কার এক মস্ত বড় আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের শরিক না হতে পারলে ওদের বেঁচে থাকাটাই হয়তো মিথ্যে হত। প্রশ্বাস নেওয়া আর নিশ্বাস নেওয়াটাই তো বেঁচে থাকা নয়। বেঁচে থাকা মানে তার চেয়েও বড় কিছু। অথচ এই মূল সত্য নিয়ে কজনেরই বা মাথাব্যথা আছে!

বৃষ্টির পরে ডানা-ভেজা পাখিদের কলকাকলিতে গামহারডুংরী মুখরিত হয়ে উঠেছে। বৃষ্টিস্নাত প্রকৃতিতে পাখিদের ডাক দৌড়াদৌড়ি করছে। ভিজে প্রকৃতির শব্দগ্রহণ ও শব্দ প্রেরণের ক্ষমতা সম্ভবত শুকনো প্রকৃতির চেয়ে অনেকই বেশি।

একটু পরই সন্ধে হয়ে যাবে। ও নতুন টাঁড়েই ছিল এতক্ষণ। অনেক নতুন গাছের চারা পুঁতছিল ও, রেবতী, রুরু আর পাখি মিলে। ওদের সঙ্গে বুধাইরাও ছিল। এমন সময়ে আকাশ কালো করে এল, ঝুরুঝুরু করে একটা হাওয়া দিতে লাগল এবং তার পরেই ঝেঁপে বৃষ্টি এল।

এবারে ফিরে আসার সময়ে পাখি শান্তিনিকেতন থেকে কয়েকটি টোকা নিয়ে এসেছিল। ছাতা এখানে কাজ দেয় না। হাওয়ার এমন তোড় যে উড়িয়ে নিয়ে যায় ছাতা। থুতনির নীচে শক্ত করে বাঁধা টোকাগুলো তাও মাথাগুলো বাঁচায়। তবে সারা শরীর ভিজে যায় বৃষ্টির তোড়ে। চুপচুপে হয়ে ভিজে ওরা ফিরে এসেছে। পাখি চলে গেছে মেয়েদের ঘরে আর ঋদ্ধি আর রুরু ফিরে এসেছে ছেলেদের ঘরে। রেবতী এখন তমালদার ঘরে আগামিকালের কাজ নিয়ে আলোচনাতে ব্যস্ত।

রুরু বলল, যাই, একবার কাকাবাবুর খবর নিয়ে আসি। তমালদা বলে রেখেছিল না আমাদের? তোরাও যাস মাঝে মধ্যে। উনি আমার একার দায়িত্ব নন।

জামাকাপড় ছেড়ে যা। জ্বর বাধালে তার হ্যাপা তো আমাদেরই সামলাতে হবে।

ছাড়ব। আমার লোহার শরীর। তোর মতো মাখনবাবু নই আমি। কলকাতার লালু ছেলে।

ঠিক আছে। জ্বরে পড়লে বুঝবি।

বলে, রুরু চলে গেল কাকাবাবুর ঘরে। কাকাবাবু, মানে তমালদার কাকা বিশাল সেন। কাকাবাবু ব্যাচেলর। মাথার গোলমাল আছে। তবে বদ্ধ পাগল যাকে বলে তা নন। তিনদিন হল এসেছেন তিনি। গৈরিকাকে তার আলাদা ঘরটির স্বাধীনতা ছেড়ে দিয়ে পাখিদের ঘরে শিফট করিয়ে দেওয়া হয়েছে তমালদার নির্দেশে। পাখিদের বলতে পাখি আর সুনয়নী। গৈরিকা যাওয়াতে তিনজন হল। চারটি চৌপাই আছে। একটি লেখার টেবিল, অ্যাটাচড বাথ। ঋদ্ধিদের ঘরেও তাই। ওরাও তিনজন। কাকাবাবুর মাঝে মাঝেই ল্যুসিড ইন্টারভ্যাল আসে। তখন একেবারেই নর্মাল।

তমালদা বলছিলেন যে, যখন পাগলামি ফিরে আসে তখনও নাকি বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝা যায় না—অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলার পরই বোঝা যায়। রাঁচীর কাঁকে রোড এর মেন্টাল হাসপাতালে ছিলেন অনেকদিন। তারপরে এই গামহারডুংরীতে তমালদা আসার পরে ওঁকে সেখান থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন। তমালদার ধারণা প্রকৃতির মধ্যে থাকলে সব রোগই সেরে যায়। উনি নাকি আগের থেকে অনেকটা ভালোও আছেন। হবে হয়তো। ঋদ্ধিরা তো আগে বিশাল কাকাকে দেখেনি। ওতো মাত্র দেড়বছরই হল এসেছে এখানে।

সন্ধে হবার আগে বৃষ্টির পরের নির্মেঘ আকাশে রামধনু উঠেছে। দুই ঘরেই একটি করে চৌপাই বেশি আছে। ওটাই ওদের সোফা। দু

ঘরের লাগোয়াই বারান্দা আছে। তাতে বেঞ্চ এবং বেতের চেয়ার পাতা। কয়েকটি মোড়াও আছে। বারান্দায় বসে তাকালে দৃশ্য অতি সুন্দর। দু'ঘর থেকেই।

কলকাতা তো দূরস্থান, রাঁচী শহরেও আজকাল রামধনু দেখা যায় না। অস্তগামী সূর্যকে ধাওয়া করে একজোড়া টিটি পাখি সেই কমলারঙা গোলকের মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে তাদের লম্বা লম্বা ঝোলানো পা-দুটি দোলাতে দোলাতে। এক আশ্চর্য নরম কনে-দেখা-আলো আলতোভাবে জড়িয়ে আছে বৃষ্টিভেজা সবুজ গাছগাছালির গায়ে। গামহারডুংরী এক অপার্থিব সৌন্দর্যে মাখামাখি হয়ে গেছে।

ডুংরীর নীচের উপত্যকার ফাঁকা, রুক্ষ, অনাবাদি জমিতেই কদিন হল সবুজায়ন চলছে। এখানে আসার আগে ঋদ্ধি গাছেদের শুধুমাত্র গাছ বলেই জানত। পাখিদেরও শুধু পাখি বলেই জানত। তাদেরও যে কত রকম থাকে তা এখানে এসেই জেনেছে।

রুরু গিয়ে ঢুকল বিশাল কাকার ঘরে। দরজাটা খোলাই ছিল। বিশাল সেন গরাদহীন জানালার সামনে হাতলহীন শালকাঠের চেয়ারে বসেছিলেন বাইরের বৃষ্টিভেজা নতুন টাঁড়ের দিকে চেয়ে। পরনে, একটি নীল সাদা চেকচেক লুঙ্গি। ঊর্ধ্বাঙ্গে একটি হাতকাটা গেঞ্জি। গেঞ্জিটা গুটিয়ে বুকের কাছে তোলা। লুঙ্গিটাও হাঁটু অবধি তোলা। বিশাল কাকা আপন মনে নরুনের উল্টোদিক দিয়ে কান পরিষ্কার করছিলেন গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে। গানটির বাণী দূর থেকে বোঝা যাচ্ছিল না। কাছে যাওয়ার পর বুঝতে পারল "রে মাম্মা, যে মাম্মা রে, রে মাম্মা রে মাম্মা রে। হামতো গ্যয়ে বাজারসে লানেকো লাঠি, লাঠি ফাঠি কুছ না মিলে, পিচ্ছে পড়ে হাথ্বী/রে মাম্মা রে মাম্মা রে, রে মাম্মা রে মাম্মা, রে-এ-এ-এ/হামতো গ্যয়ে

বাজারসে লানেকা রোটি, রোটি ফোটি কুছ না মিলে, পিছে পড়ে মোটি/রে মাম্মা রে মাম্মা রে, রে মাম্মা রে মাম্মা রে।"

রুরু কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বিশাল সেন বললেন, কী রে! কী মনে করে?

ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন হবে। নাম যদিও বিশাল চেহারা কিন্তু একেবারেই শীর্ণ। তমালদা মেস এর রাঁধুনি মুনরী, হেল্পার ঝাঝা এবং কাজের লোক বুধাই আর ঝিরিকে বলে দিয়েছিল যত্ন-আত্তি করে বিশালকাকাকে মোটা করতে হবে—তবে শরীর বা মাথা গরম হয় এমন কিছু খাওয়ানো চলবে না। আরও বলেছিল যে বিশাল কাকার মুখ খুবই খারাপ। মুখ খারাপ করলে যেন ওরা মনে কিছু না করে।

না, আপনার খোঁজ নিতে এলাম। তমালদা বলে দিয়েছে আপনার দেখাশোনার ভার আমার।

রুরু বলল।

—কেন? আমি কি তোদের তমালদার রাখনি রে, আমার খোঁজ নিতে এসেছিস?

—'রাখনি' মানে কী?

রুরু অপরিচিত শব্দটা শুনে বলল।

—রাখনি মানে জানিস না? রাখনি মানে রক্ষিতা, কেপ্ট।

—কখনও শুনিনি তো ওই শব্দটা আগে।

—তুই কি কখনও রক্ষিতা রেখেছিস যে জানবি। নদে জেলার মানুষেরা রক্ষিতাকে বলে 'রাখনি'। আমাদের দেশ তো ছিল নদে জেলার বাদকুল্লাতে। আমি কৃষ্ণনগরের রাজ কলেজে পড়েছি। তমাল পড়েছিল ডিস্ট্রিক্ট স্কুলে। আমরা থাকতাম গাছ-গাছালি ঘেরা নেদেরপাড়ার একটি বাড়িতে। তখন থেকেই গাছের পোকা ওর

মাথায় ঢোকে। তাপ্পর জমিজমা সব বেচে দিয়ে বড়দা রাঁচীতে চলে এলো ট্রান্সপোর্টের ব্যাবসা করবেন বলে। দাদা মানে, তমালের বাবা।

ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে একটা টাটা-মার্সিডিজ ট্রাকও কিনল। রাঁচী থেকে ছাগল কিনে কলকাতাতে চালান দিত। আমি ইংরেজির ছাত্র ছিলাম কলেজে। আর্টস এর ছেলেরা পরীক্ষা পাশ করে কোনো চাকরিই পায় না। চাকরি পেত মাথামোটা কমার্সের ছাত্ররা। ইংরেজি-নবিশ হয়ে ট্রাকে, ড্রাইভারের পাশে বসে থাকতাম। একটা থলের মধ্যে দু'হাজার টাকার দশ টাকার নোট নিয়ে। সারা রাত ট্রাক চলত। সকালে কলকাতা পৌঁছাতাম। তখন তো রাস্তাঘাট বাজপেয়ীজির কল্যাণে এত ভালো হয়ে যায়নি।

—কেন? নোটের থলে কেন?

—আরে, সারা পথ পুলিশদের পয়সা দিতে দিতে আসতে হত। কোথাও দশেই রফা হত। যতই কলকাতার কাছে আসতাম ততই রেট বেড়ে যেত। যাচ্ছেতাই লাগত।

—এখনও দিতে হয় নাকি?

বিলক্ষণ হয়। এখন হয়তো রেট অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে। শালার মুখে মুখেই যত সততার গল্প। সব করাপট্। যে দেশে মানুষগুলোই সব পোকা-খাওয়া সে দেশের রাস্তাঘাট কলকারখানা হলে কী হবে! সব শালারা চুতিয়া।

চুতিয়া বলেই, জিভ কাটলেন।

রুরু হাসছিল। কিন্তু চিন্তাও হচ্ছিল। বিশাল কাকা যদি পাখিদের সামনে এমন সব ভাষা ব্যবহার করেন? ওরা তো ভীষণই অপ্রতিভ হবে।

বিশাল কাকা বললেন, যার যা গড়ন, বুঝলি না। শালা! কষে লুঙ্গি বাঁধতে পারি বটে কিন্তু মুখটাকে বাঁধতে পারলাম না।

—কাকা আপনাকে রাঁচীর রোডের মেন্টাল হাসপাতালে ভর্তি হতে হল কেন? আপনি তো অ্যাবসল্যুটলি নর্মাল। ভর্তি করালেন কে?

—কে আবার? তোমাদের তমালদার বাবা। যত্তসব পাগলের কাণ্ড!

তবে আমার যে কিছুই হয়নি সে কথা দাদা পরে বুঝেছিলেন। দাদার এক বন্ধু ছিল চক্রধরপুরের চারু চট্টখণ্ডী। সে শালার লটরপটর ছেল আমার পরমাসুন্দরী বউদির সঙ্গে। অ্যালায়েড কেমিস্ট্রি নিয়ে বি.এস-সিতে ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করে যে মানুষ রাঁচীতে ছাগলের ব্যবসা করতে আসে, সে পাগল ছাড়া কী?

বলেই বললেন, কে?

কে?

রুরু বলল।

কে আবার? আমার দাদার কথা বলছি।

নিজে সারাদিন ঘুরে ঘুরে মুসলমান ছাগলওয়ালাদের কাছ থেকে ছাগল, পাঁঠা জোগাড় করত আর রাতে পাঁঠাদের ট্রাকে গাদাই করে কলকাতা পাঠাত সে, সে পাগল ছাড়া কী? আরে, শালা বুদ্ধিমানদের চালান করতে পারলে তাও না হয় বুঝতাম।

—তারপর?

—তারপর আর কি? দাদা সারাদিন বাইরে বাইরে থাকত আর আমি থিয়েটারের মহড়া দিতাম আর চট্টখণ্ডী দুপুরবেলা বাড়িতে গিয়ে বউদিকে চাঁট মারত। সেও তার স্টোন চিপস আর বালির ব্যবসার একটা ব্রাঞ্চ খুলে ফেলেছিল রাঁচীতে। তবে সে শালা বুদ্ধিমান ছিল। বে-থা করেনি। সে তো আমিও করিনি। কিন্তু পাঁঠাদের সঙ্গে থেকে থেকে আমার আর দাদার বুদ্ধিটা পাঁঠাদের মতো হয়ে গেছিল।

—ট্রাকে আপনিও যেতেন। তমালদার বাবাও যেতেন।

—হ্যাঁ, যেতেন। তবে দাদা বিহার বর্ডার অবধি ট্রাক পাস করিয়ে ঘুষের টাকার থলেটা আমার জিম্মাতে দিয়ে কোনো ধাবাতে রুটি তড়কা খেয়ে পরদিন সকালে কোনো ট্রাক ধরে রাঁচীতে ফিরে যেত।

অনেকখানি রাস্তা ধানবাদ চাস হয়ে যেতে হতো তখন।

বর্ডার তো ছিল বরাকরে তাই না?

হ্যাঁ। দাদার রাঁচী ফিরতে ফিরতে পরদিন দুপুর বা শেষ বিকেল গড়িয়ে যেত। তখন তো আর বহড়াগড়া টাটা হয়ে যাওয়া যেত না।

আমরা দু ভাই পাঁঠা নিয়ে রাত কাটাতাম নিজেরা, পাঁঠা বলেই, আর বুদ্ধিমান চট্টখণ্ডী আমাদের রাঁচীর বারিয়াতুর বাড়িতে বউদির ওলানে টুঁ মারত।

বলেই বললেন, এসব গোপন কথা যেন ফাঁস করিসনি কোথাও। পাগলে কি না বলে ছাগলে কি না খায়? আমি যদি সত্যি সত্যিই পাগল হতাম তবে কি তোর মতো আনজান ছোঁড়াকে এইসব গোপন কথা বলি?

তুইই বল?

উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে রুরু বলল।—তা আপনাকে পাগলা-গারদে ভরে দিল কে?

ওর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছিল। তমালদা যদি জানতে পারে সে তার কাকার সঙ্গে এইসব আলোচনা করছে তাহলে বন্দুক দিয়ে তার খুপড়ি উড়িয়ে দেবে। মানুষটা এমনিতে নরম কিন্তু চোখের দিকে তাকালে বোঝা যায় যে, সে ভয়াবহ। তমালদার কাছে বন্দুক তো আছেই পিস্তলও আছে। এ অঞ্চলের, তামারের, সব মানুষ, মুরহুর এমনকি ডাকাত রিসিয়া মুণ্ডা পর্যন্ত তমালদাকে সমীহ করে চলে।

—গারদে ভরে দিল দাদাই। তবে ওই চট্টখণ্ডীরই দুর্বুদ্ধিতে। আমি একদিন সেই চুতিয়াকে আর বউদিকে দেখে ফেলেছিলাম দুপুর বেলায়।

কী দেখেছিলেন?

তুই তো ভীষণ ইনকুইজিটিভ।

না, ইচ্ছে না হলে বলবেন না।

না বলার কী আছে? সে শালা বউদির দুদু খাচ্ছিল। ওলানে ঢুঁ মারছিল। দেখতে ভারি ভালো ছিল আমার বউদি, মানে, তমালের মা। তবে যব মিঞা বিবি রাজি, ক্যায়া করে কাজি।

তারপর বিশাল কাকা বললেন, পাগলা গারদে আমাকে তিন তিনটে বছর রেখেছিল পাগলদের সঙ্গে জানিস। আরে পাগলদের সঙ্গে ওঠা-বসা করে আমি নিজেই যে সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাইনি এই ঢের।

তাপ্পর দাদা আমাকে একদিন নিতে এল। বোঝ, তিনবছর পরে। দাদা নিজেই পাগল ছিল তো। তা আমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে বারিয়াতুর বাড়ির দিকে এগোল দাদা। দাদা বললে, বিলে, তোর বউদি তোর জন্যে বিউলির ডাল, আলুপোস্ত আর পাবদা মাছ রেঁধেছে আজ।

আমি বললাম, ফার্স্টক্লাস।

আরও কিছুক্ষণ পরে দাদা বলল, তোর মাথার তো কোনোই গোলমাল দেখছি না আমি। তোকে কেন মিছিমিছি এতদিন ওখানে আটকে রাখল বলত বিলে?

আমি বললাম, কী আর বলব দাদা, সবই শালা আমার পোঁদের দোষ।

বলেই, কপালে আঙুল ঠেকিয়ে পোঁদ দেখালাম।

দাদার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। মুখে কিছু বলল না।

—তমালদা সেই চট্টখণ্ডীকে কিছু বলতেন না? উনি তো খুব ডাকসাইটে মানুষ ছিলেন ছেলেবেলা থেকেই।

—তারপর বিশাল কাকা গলা নামিয়ে বললেন, বলেছিল তো। ও না প্রতিকার করলে আর কে করবে! নিজের মা বলে কথা। আমি তো একটা গাণ্ডু ছিলাম। ফার্স্টক্লাস গাণ্ডু ছিলাম।

—কী করেছিল তমালদা?

—গলা নামিয়ে বিশাল কাকা বললেন, কী আবার? মার্ডার।

—মার্ডার?

—না তো কী? সেই শালা চট্টখণ্ডী নদী থেকে বালি তোলার জন্য একদিন তার ট্রাক নিয়ে লোহারডাগার দিকে গেছিল। বানারির কাছে জঙ্গলের নির্জন পথে তাকে আর ট্রাকের ড্রাইভার আর খালাসিকেও গুলি করে মারে তমাল।

—তাই?

—তাই তো। ও তো এম.সি.সির দলে নাম লিখিয়েছিল। এখনও বোধহয় নাম কাটেনি।

—চট্টখণ্ডীকে মারলেন মারলেন, বেচারি ড্রাইভার আর খালাসি কী দোষ করেছিল?

—দ্যাখ এসব ব্যাপারে নিষ্ঠুর হতে হয়। না মারলে, ওরা সাক্ষী দিত না? ওদের না মারলে কি চলত?

তা ঠিক।

তবে চট্টখণ্ডীর এবং ওদের ডেডবডি পালামৌর জঙ্গলে ফেলে দিয়ে ট্রাক নিয়ে রাঁচীতে এসেই নাম্বার প্লেট রাতারাতি বদলে সেই ট্রাক বেচে দিয়ে যে টাকা পেয়েছিল তা তো ড্রাইভার আর খালাসির স্ত্রীদের সেভেন ইজটু থ্রি করে পাঠিয়ে দেয় ওর চেলাদের দিয়ে।

কোথায়?

ড্রাইভার আর খালাসির বাড়িতে।

চোখ বড় বড় করে রুরু বলল, আপনি এসব জানলেন কী করে। তমালদা কি বলেছিল আপনাকে?

না, না, আমায় কিছুই বলেনি তমাল। তবে যখন পাগলা গারদে থাকতাম তখন অনেক ভাবতাম তো। তখনই ভেবে ভেবে বের করেছি। এমনটিই নিশ্চয়ই হয়েছিল, কারণ, হবার কথা ছিল।

রুরু বলল, আপনার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো কাকাবাবু, এই গামহারডুংরীতে?

—হচ্ছে বইকী বাপ। তোমাদের গাধাই যে সেই চারটের সময়ে এক কাপ ঠান্ডা চা দিয়ে গেল তারপর কি আরেক কাপ দিতে পারত না? ওকে, মানে, তোমাদের গাধাইকে বলে দেবে আমাকে বরযাত্রী পার্টির লোক হিসেবে ট্রিট করবে।

—কাকাবাবু ওর নাম গাধাই নয়, বুধাই।

—হল। আমি ওকে গাধাই বলেই ডাকব।

—ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি কিচেনে। আপনাকে চা পাঠিয়ে দিতে বলছি ফ্লাস্কে করে।

—ফ্লাস্কে করে দেবে কেন? গরমাগরম নিয়ে আসবে। মধ্যে একটু আদা আর তেজপাতা দিতে বল। গলাটাতে ঠান্ডা লেগেছে।

—আমি তাহলে এখন যাই কাকাবাবু?

—যাওয়া নেই এস। আমার মা বলতেন এ কথা।

—রুরু যখন বেরোচ্ছে তখন দেখল বুধাই একটা লণ্ঠন হাতে আসছে বিশাল কাকার ঘরে। লণ্ঠনটা ওঁর ঘরে রেখে যাবে। ভাল করে জ্বাল কাঠের ছাই দিয়ে মেজে চিমনিটাকে ঝকঝকে করেছে। বুধাইকে দেখে ওঁর চায়ের কথা বলে দিল রুরু। বিশাল কাকা বললেন, ওই যে গাধাই এল।

যে যখন চৌকাঠে তখন বিশাল কাকা বললেন, জীবনে একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলেছিলাম, জানো গুরু।

আজ্ঞে আমার নাম রুরু।

ওই হল। তোমাকে আমি গুরু বলেই ডাকব।

ঠিক আছে। কিন্তু কী ভুল করেছিলেন?

লাইন চুজ করতে। বুঝলে কি? লাইন চুজ করতে ভুল করেছিলাম।

মানে?

মানে, হয় ক্রিকেটটা খেলা উচিত ছিল নয়তো ছবি আঁকা। এ দুটোর একটা যদি করতে পারতাম ভালো করে তবে আজ সকলের পোঙা মারতাম। টাকার পাহাড়ে বসে থাকতাম।

রুরুর কানদুটো অনেকক্ষণ থেকেই গরম হয়ে উঠছিল, এবারে একেবারে লাল হয়ে উঠল। বিশাল সেন এর ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে উদলা প্রকৃতির মধ্যে পড়ে প্রাণ বাঁচল। বৃষ্টি শেষের হাওয়াটা নানা গাছগাছালির গন্ধ বয়ে আনছে মুরহুর দিক থেকে। শীত শীত করছে। ঋদ্ধি ঠিকই বলেছিল। ঠান্ডা লেগে যেতে পারে।

ডুংরীর ঘরে পৌঁছে দেখল পাখি, গৈরিকা আর সুনয়নী তিনজনেই এসেছে। ওদের বারান্দাতে বসে আছে। ঋদ্ধি আর রেবতীও বসে আছে। ঋদ্ধি লণ্ঠনটাকে রেখেছে দরজার পাল্লার আড়ালে যাতে চোখে আলো না লাগে। ও বাতিকগ্রস্ত। চাঁদের আলো যেমন উপভোগ করতে চায় তেমন অন্ধকারও। ওদের সামনে একটা জামবাটি রাখা। তাতে তালের বড়া গরম গরম, আর শালের বড় দোনাতে এক দোনা মুড়ি আর তার মধ্যে বাদামভাজা। গৈরিকা, আজ যে রথযাত্রা সে কথা মনে করে সকালেই ঝিরিকে নিয়ে তাল গুলেছিল। এ দিকে তালগাছ বিশেষ নেই। ঝিরি লাইনের

বাসড্রাইভার রামশরণকে দিয়ে খুঁটি থেকে আনিয়েছিল। বিকেলে নতুন টাঁড় থেকে ফিরে এসে বড়াগুলো ভেজেছে।

রুরু বলল, তমালদাকে পাঠিয়েছিস?

না। তমালদা এখানে আসবে বলেছে।

রথযাত্রাই যখন মনে করলি তখন একটু পাঁপড় ভাজা করলি না কেন গৈরিকা?

ভুল হয়ে গেছে।

বিশালকাকাকে একটু দিয়ে আসব না কি?

সুনয়নী বলল।

তোর যাবার দরকার নেই। ইচ্ছে করলে বুধাইকে দিয়ে ওঁর ঘরে পাঠিয়ে দিস। বুধাই একটু পরেই চা নিয়ে যাবে ওঁর ঘরে। আমাদের ঘরের সামানে দিয়েইতো যাবে। ওকে বলে এসেছি।

তারপর বলল, বুধাই এর নাম দিয়েছেন উনি গাধাই। আর আমার নাম গুরু।

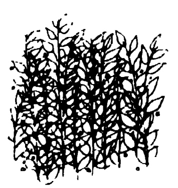
ঋদ্ধি বলল, রতনে রতন চেনে।

তারপর বলল, কেমন বুঝলি রে রুরু? ভায়োলেণ্ট টাইপ?

না। তবে মুখটা বড় খারাপ। মেয়েদের না যাওয়াটাই নিরাপদ।

—এরকম ব্যাপার। তবে তো কালই একবার গিয়ে স্যাম্পল করে আসতে হবে।

রেবতী বলল।



●

পরদিন সকালে মেঘ সরে গিয়ে ঝকঝকে রোদ উঠেছে। আষাঢ়েই মনে হচ্ছে যে শরৎ এসে গেছে। গতকাল শুধু নয়, চার পাঁচদিন ধরে লাগাতার বৃষ্টি হওয়াতে গামহারডুংরী আর তার আশপাশের চেহারাই পাল্টে গেছে। গামহারডুংরীতে অনেক গাছগাছালি তমালদা এবং বুধাইরা ঋদ্ধিরা আসার আগেই লাগিয়েছিলেন। তবে এই নতুন টাঁড়ে গাছ এখন লাগানো হচ্ছে। আশেপাশের মুন্ডারিদের গ্রামে অনেক চারা দিয়েছেন তমালদা। তারাও লাগিয়েছে সেসব গাছ। পশ্চিমবঙ্গের বনবিভাগ যাকে 'সামাজিক বনসৃজন' বলেন, তাইই। আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, জাম, আরও অনেক প্রয়োজনের গাছ--ফলবাহী গাছ। সেইসব ফল পাখিরাও খাবে, মানুষেও খাবে।

বৃষ্টির পরে ধুলোবালি ধুয়ে মুছে যাওয়াতে ক্লোরোফিল উজ্জ্বল গাছগাছালিরা যেন ঝলমল করে হাসছে। সূর্যের আলো দশগুণ হয়ে প্রতিফলিত হয়ে চারিয়ে যাচ্ছে দিকে দিকে। ঋদ্ধিরা ছ'জনে মিলে পুরো এলাকাতে ছড়িয়ে গিয়ে, যেসব চারা গত কদিনে লাগানো হয়েছে, তাদের পরিচর্যা করছে। গাছ তো কম লাগানো হয়নি এবং কম রকমও নয়। শ্বেত শিমুল, যাদের ইংরেজি নাম KAPOK, তুঁত, সজিনা, কুল, কয়েতবেল, পেয়ারা, রুদ্রাক্ষ, অশ্বত্থ, ফলসা, খয়ের, চালতা, হলুদ, তমাল, করঞ্জ, শিমুল, নাগেশ্বর, পুত্রান্দীবা, কাজু, রিঠা, আঁশফল, যজ্ঞিডুমুর, আতা, বরুণ, পাইন, নারকেল, বেল, হিজল,

তেঁতুল, আমড়া, দেবদারু, পরশপিপুল, পিটালি, ঘোড়া করঞ্জ, ঘোড়া নিম, গাব, টুন, কনকচাঁপা, অমলতাস, গামহার, কাঞ্চন, বকুল, কৃষ্ণচূড়া, নিম, জাম, মাদার, সেগুন, ছাতিম, অশোক, অর্জুন, পলাশ, হলুদ, আমলকী, বহেড়া, হর্তুকি, চাঁপা, পিয়াশাল, কুর্চি, কুসুম, মহুয়া, পিয়াল এবং শাল। গাছ লাগানো শুরু হয়েছিল সাতদিন আগে থেকে। আশা করা যায় যে আজ শেষ হয়ে যাবে পরিচর্যা।

ডুংরীর উপরের গাছগুলি সব লাগানো হয়েছে বছর পাঁচ-সাত হল। তারা মাটি ধরে নিয়েছে এবং প্রতি বর্ষাতে তরতর করে বাড়ছে। এখন দেখলে নবীন জঙ্গল বলে মনে হয়। পরে এখানে নিবিড় জঙ্গল হয়ে যাবে। নানারকম পাখপাখালি ও ছোট জানোয়ার যেমন খরগোশ ও বেজির দেখা পাওয়া যাচ্ছে এবং নানারকম বিষধর ও নির্বিষ সাপ, মেঠো ইঁদুর, ব্যাং, বিশেষ করে কুটুরে ব্যাং। পাখির মধ্যে সিপাহি বুলবুল, এমনি বুলবুল, ঘুঘু, ময়না, কোকিল, হলুদ বসন্ত, ছাতারে, নানারকম মৌটুসি নানা ফলের মধু খায় তারা, বড়বড় বাদামি-কালো ক্রোফেজেট, তিতির, বটের। টিয়া থাকে না, তবে ঝাঁকে উড়ে আসে ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দ করতে করতে। দেখতে সুন্দর হলে কী হয়। পেয়ারা এবং অন্যান্য ফল বড় নষ্ট করে তারা। তাই এখানের গ্রামীণ মানুষ ভালোবাসে না টিয়াদের। টিয়াদের নাম এখানে সুগা।

গামহারডুংরীর নাম এমন হয়েছে, কারণ ডুংরীর মাথাতে প্রায় কুড়ি পঁচিশটি বড়বড় গামহার গাছ আগে থেকেই ছিল। নামটা তমালদার দেওয়া নয়, স্থানীয় মানুষদেরই দেওয়া। এই গাছগুলো কাটা নিয়েই মুরহুর কাছে করাতকলের মালিক সর্দার যোগীন্দর সিং-এর সঙ্গে তমালদার বিরোধ ঘটে। খুঁটি থেকে ভাড়া করা গুণ্ডাদের নিয়ে আসে যোগীন্দর সিং তমালদাকে ভয় দেখাতে। এবং তাদের করাতিরা চার

পাঁচটি গাছ কেটেও ফেলে। যোগীন্দর সিং তমালদাকে শাসায় যে এই সব গাছ কাটতে না দিলে তমাল সেন এর লাশ ফেলে দেবে সে। গুণ্ডারা ছোরা ছুরি ও মুঙ্গেরে তৈরি ওয়ান-শটার নিয়ে এসেছিল।

এই পুরো অঞ্চলটাই ইতিমধ্যে ন্যাড়া হয়ে গেছিল অনেক বছরের বৃক্ষ ছেদনে। নানা ঠিকাদারেরা ক্লিয়ার ফেলিং করেছিল। আইন শৃঙ্খলাহীন স্থানীয় মানুষেরাও সেই বন-বিনাশে কোনো না কোনোভাবে শামিল হয়েছিল।

মুণ্ডাদের বসতবাড়িতে যে কটি আম কাঁঠালের গাছ ছিল তাও তাদের মেয়েদের বিয়ের সময়ে মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে যোগীন্দর সিং কেটে নিয়ে যেত। একসময়ে যে সব টাঁড় এবং ডুংরীতে ঘন জঙ্গল ছিল, খরগোশ, ময়ূর, তিতির, বটের, ছোট কোটরা হরিণ এবং শুয়োরের আড্ডা ছিল সেসব মরুভূমি হয়ে গেছিল। লেপার্ডও ছিল অনেক, যারা স্বাভাবিক শিকার ছাড়াও নীচের নানা গ্রামের গোরু বাছুর মেরে খেত, বিশেষ করে বর্ষাকালে। এখন প্রায় তার কিছুই নেই। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্রের বৃষ্টি ওইসব ন্যাড়া ডুংরী আর টাঁড়কে ভিজিয়ে দিত। ছোট ছোট শাল আর পলাশের চারা অবশ্য গজাত প্রতি বছরই প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে কিন্তু সেগুলো একটু বড় হতেই গ্রামবাসীরাই তাদের জ্বালানি এবং শীতের রাতে আগুন পোয়ানোর জন্যে কেটে ফেলত।

তমালদা গতবছর থেকে ফতোয়া জারি করেছে যে, যে একটাও গাছ বা চারা কাটবে, তার হাত কেটে দেবে।

গামহারডুংরীর গামহার গাছগুলি কাটা নিয়ে তমালদার সঙ্গে সর্দার যোগীন্দর সিং-এর যে বিরোধ তার নিরসন হয়েছে যোগীন্দরের

প্রাণের বিনিময়ে। এই গামহারডুংরীর মাথাতেই যোগীন্দর এবং তার ভাড়া করা গুণ্ডাদের গুলি করে মারে তমালদা এবং রাঁচী থেকে আসা তার সঙ্গীরা। গাছ কাটা যে মানুষ মারারই মতো অপরাধ এ কথা বুঝিয়ে দেয় তমালদা এই অঞ্চলের সমস্ত মুণ্ডাদের। পুলিশ তমালদাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায়। কিন্তু গ্রামবাসীরা গিয়ে থানা ঘেরাও করে। পুলিশ তাদের ওপরেও গুলি চালায়। প্রায় দশজন গ্রামবাসী মারা যায়। কিন্তু সেই রাতেই থানার ওপরে চড়াও হয় এম.সি.সির ছেলেরা। দারোগা এবং পাঁচজন পুলিশকে গুলি করে মারে, রাইফেল ও গুলি সব লুঠ করে এবং থানা জ্বালিয়েও দেয়।

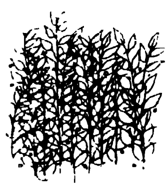
বিরসা মুণ্ডা ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়াই করেছিল স্বাধীনতার জন্য আর বিরসার উত্তরসূরীরা তমালদার নেতৃত্বে লড়াই করেছিল মুনাফাবাজ ঠিকাদার আর অসৎ পুলিশদের সঙ্গে এও প্রায় আর এক ‘উলগুলান’। সবুজায়নের জন্যে উলগুলান। গাছ না বাঁচলে, বন না বাঁচলে তারা নিজেরাও যে বাঁচবে না একথাটা প্রতি গ্রামে গিয়ে রাতের অন্ধকারে মিটিং করে, কানে কানে প্রতি হাটে, এই সবুজের মন্ত্র দিয়ে এই পথভ্রষ্ট মানুষদের ঠিক পথে ফিরিয়েছিল তমালদা এবং তার অনুসারীরা।

রাঁচী থেকে বড় ফোর্স আসে কিন্তু তমালদা ফেরার হয়ে যায়। তারপর নতুন জায়গাতে নতুন থানা বানায় ওরা, পুরানো থানার অদূরে। কিন্তু ঝাড়খণ্ড এর মুখ্যমন্ত্রী থানার দারোগাকে বলে দেন যে ওই অঞ্চল বিরসা মুণ্ডার অঞ্চল। এখানের মানুষেরা বীর বিরসার অনুগামী। গাছ যদি কেউ কাটে তবে যে কাটবে তাকে যেন না ছাড়া হয়।

কিছুদিন পরেই তমালদা ফিরে আসে। তমালদাকে গ্রেপ্তারও করা হয় খুঁটিতে। ওই কেস ওঠে বটে কোর্টে কিন্তু একজন মানুষও সাক্ষী দেয় না। সাক্ষীর অভাবে তমালদা বেকসুর খালাস পেয়ে যায়।

খালাস হয়ে গিয়ে এই গামহারডুংরীতেই ডেরা বানায় তমালদা এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে, এই সারা অঞ্চলকেই সে সবুজ করে দেবে। এখন এই তার জীবনের ব্রত। স্থানীয় মানুষেরা দেবতাজ্ঞানে পুজো করে তাকে। নানা গ্রামের পঞ্চায়েত থেকে নানা বিবাদে সালিশি করার জন্যও ডাকে।

এখানে ঋদ্ধিরা ফুলের বাগান করতে আসেনি। সবুজায়নকে জীবনের ব্রত করেছে ওরা সকলে।



●

আজকে হাটবার। আজকে ওদের সকলের ছুটি। নতুন-টাঁড়ের গাছগুলো নতুন লাগানো হয়েছে বলে এবং তাদের বিশেষ পরিচর্যার দরকার বলেই আজকের ছুটি বাতিল করে দিয়েছে তমালদা। তবে বিকেলে, সকলে মিলে হাটে যাবে। তমালদাও যাবে। বিশাল কাকা যাবেন কি না জানা নেই। তমালদাই ঠিক করবে।

ওদের কাজ শেষ হতে হতে বেলা বারোটা বাজল। বৃষ্টি থেমে গেছে বলেই রোদটাকে খুবই কড়া লাগছে। মাথার টোকাও যেন অপ্রতুল। ওরা ছ'জনই ফিরে চলল ডুংরীতে। বেশ অনেকখানি খাড়া উঠতে হয়। তবে বয়স্ক ও অশক্তদের জন্যে একটি কেয়ারি—করা ঘোরানো পথ আছে। তাঁরা সেই পথেই ওঠেন।

গামহারডুংরীর একটি দু-কামরার অতিথিশালাও আছে। অতিথিশালা বটে তবে কোনো বিশেষ খাতিরদারির বন্দোবস্ত নেই। সকলে যে খাবার খাবেন তাঁরাও তাই। তবে ওখানে তমালদার এই ক্রিয়াকাণ্ড দেখতে এবং তার এই সবুজায়নের ভাবনাতে শামিল হতে দেশি-বিদেশি যাঁরাই আসেন তাঁরাও মান্যগণ্য হলেও সমমানসিকতার মানুষ, যতই ধনী বা প্রভাবশালী হন না কেন। অতিথিশালা সাধারণ হলেও সব আধুনিক বন্দোবস্তই আছে। কমোড আছে। শাওয়ার আছে। এমনকী মেয়েদের জন্যে বিদেও আছে।

মুণ্ডারি ভাষাতে দুটি শব্দ আছে "রিঙ্গিচিঙ্গি চিকনপিন্ডা" মানে, ঝকঝকে তকতকে। তমালদা বলে, ঘরদোর যতই সাধারণ হোক না

কেন, সবসময়ে "রিঙ্গি চিঙ্গি চিকনপিন্ডা" করে রাখবি। মাদার টেরিজা বলতেন না? "ক্লিনলিনেজ ইজ গডলিনেস"।

খুব দামি কথা।

দু'বছর আগে কানাডার মনট্রিয়াল এবং কিবেক সিটি থেকে দুটি ফরাসি দম্পতি এসেছিলেন। শুধু যে বনসৃজন করে তমালদা তাই নয়, মুণ্ডারি ছেলেমেয়েদের জন্যে তাজনা নদী পারের কৃষ্ণচূড়া গাছেদের তলায় একটি প্রাইমারি স্কুলও করেছে সে। তা সে স্কুলের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাফিলিয়েশান নেই। ইংরেজি, মুণ্ডারি, হিন্দি, প্রাথমিক অঙ্ক এইসব পড়ানো হয় সে স্কুলে। ঋদ্ধি, রেবতী, গৈরিকা সুনয়নী ও রুরুই আর দুজন শিক্ষিত মুণ্ডারি ছেলেমেয়েও আছে, ওদের সঙ্গে। তাজনা নদীর পাড়ে তাজনা গ্রামের কাছে সেই এক চালা স্কুল।

সেই দুই ফরাসি দম্পতি ফিরে গিয়েই তাঁদের ট্রাস্ট থেকে প্রচুর টাকার দ্বিমাসিক অনুদানের বন্দোবস্ত করেছেন গামহারডুংরীর জন্যে। ওঁদের সংস্থার সঙ্গে ইউনিসেফ এরও যোগ আছে। তারপর থেকেই তমালদার অর্থাভাব আর নেই। ঋদ্ধিদের এবং অন্যান্যদেরও মাইনে ও অন্যান্য সুবিধা অনেক বেড়েছে। তবে প্রতি বছর কলকাতা থেকে অডিটরেরা এসে খাতাপত্র সব অডিট করে যান।

তাজনা নদী বয়ে গেছে খুঁটি আর মুরহুর মধ্যে দিয়ে। মুরহুর জার্মান লাক্ষা কারখানাতে অনেক মুণ্ডারি নারী-পুরুষ কাজ করে। কানাঘুষা শোনা যাচ্ছে যে, ব্যাংকের কাছে অনেকই ধার হয়ে গেছে কোম্পানির—ধার শোধ দিতে পারবে না বলে কোম্পানি নাকি বন্ধ হয়ে যাবে। প্রায় আড়াইশো তিনশো শ্রমিকের রুজিরোজগার বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে। কী হবে, কে জানে!

এই স্কুলে পড়াবার জন্যেই নাকি তমালদা বিশাল কাকাকে নিয়ে এসেছে এখানে। স্কুলটার ভার পুরোপুরি তাঁর উপরেই দিয়ে দেবে। বিশাল কাকাকে এখানে আনার আগেই তমালদা বলেছিল ওদের সকলকে যে, বিশালকাকা বিশাল পণ্ডিত। উনি খুঁটিতে লুথেরান জার্মান মিশনে কাজ করেছেন পনেরো বছর। খুব ভাল মুণ্ডারি জানেন। উনি যখন ওই মিশনে যোগ দেন তখন ফাদার পি. পনেট. বেঁচে ছিলেন। অনেক বড় বড় নৃতত্ত্ববিদদের সঙ্গেও ওঁর আলাপ হয়েছিল। যেমন রামচন্দ্র গুহ। ফাদার হফফম্যান কমেমোরিয়াল ভল্যুমের সম্পাদনার কাজে উনি নাকি একজন সহকারীও ছিলেন।

রেবতী জিগগেস করেছিল, ওই রকম লেখাপড়ার কাজে থাকতে থাকতে কাকাবাবুর মাথাটা খারাপ হল কী করে।

সে অন্য গল্প। তোরা তো সবাই প্রাপ্তবয়স্ক এবং প্রাপ্তমনস্কও বটে। ওই মিশনেরই হাসপাতালে ইসাবেলা নামে একজন অপরূপ সুন্দরী এবং বিদুষী নার্স ছিলেন। আমি তাঁকে আমার ছেলেবেলাতে দেখেছি। আচরণে কথাবার্তায় অত্যন্তই সম্ভ্রান্ত, আর তাঁর চেহারাটি ছিল এমন যে তিনি একবার তাকালেই যে-কোনো রুগিই ভালো হয়ে যেত।

খুঁটিতে থাকাকালীন কাকার একবার ম্যালিগনান্ট ম্যালেরিয়া হয়। সেবার নাকি প্রায় মড়কই লেগেছিল। ইসাবেলার যত্ন ও সেবাতেই কাকা ভালো হয়ে ওঠেন বটে কিন্তু ইসাবেলার প্রেমেও পড়ে যান। ওঁরা তো সব দীক্ষিতা। বিয়ে তো করতে পারবেনই না উপরন্তু সব কামনা বাসনার ঘরেও চাবি বন্ধ। ইসাবেলাও ভালোবেসে ফেলেছিলেন কাকাকে কিন্তু তা প্রকাশ করার কোনো উপায় ছিল না। কাকা তো মাথার যন্ত্রণাতে পাগল অবস্থাতে ইসাবেলা ইসাবেলা বলে চিৎকার করে উঠতেন। তাতেই ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায়।

ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া বড় সাংঘাতিক রোগ। মস্তিষ্কের উপরে প্রচণ্ড চাপ পড়ে। মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় অধিকাংশ সময়ে। তখনকার দিনে এই রকম ছোট জায়গাতে তেমন আধুনিক ওষুধপত্রও পাওয়া যেত না। তেমন ভালো ডাক্তারও ছিলেন না। যদিও যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সকলেই বিবেকবান ও আন্তরিক ছিলেন। কলকাতার ডাক্তারদের মতো ফাঁকিবাজ আর অর্থগৃধ্নু আদৌ নন। কাকার মাথা খারাপ হওয়ার মূলে এ রোগ।

—আর সেই দীপিতা সেবিকা ইসাবেলা?

আমরা সমস্বরে বলেছিলাম।

তমালদা একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, তোদের মধ্যে কে কে আর্নেস্ট হেমিংওয়ের লেখা পড়েছিস?

ঋদ্ধি আর পাখি হাত তুলেছিল।

কী কী বই পড়েছিস?

ঋদ্ধি বলেছিল, 'দ্যা ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্যা সি'। 'ফর হুম দ্যা বেল টোলস' আর 'মেন উইদাউট উইমেন।'

—বাঃ তবে তো অনেকই পড়েছিস? আর তুই পাখি?

—আমি একটাই পড়েছি। 'ফর হুম দ্য বেল টোলস'।

তমালদা বলেছিল, 'ফর হুম দ্যা বেল টোলস' এর প্রারম্ভে বিখ্যাত ইংরেজ কবি জন ডান এর একটি লেখা থেকে উদ্ধৃতি ছিল। এভরি ম্যানস ডেথ ডিমিনিশেস মী। ফর হুম দ্যা বেল টোলস, দ্যা বেল টোলস ফর দী।" তা থেকেই উপন্যাসের নাম : 'ফর হুম দ্যা বেল টোলস'।

তারপরে পাখি বলল, কিন্তু আমি হেমিংওয়ের একটি জীবনীও পড়েছি।

—কোনটা?

—পাপা হেমিংওয়ে। হেমিংওয়ের বন্ধু। এ. ই হচনার-এর লেখা। হিলারিয়াস বই।

তাহলে তুইতো অ্যাগনেস-এর কথা জানিসই।

তমালদা বলেছিল।

কোন অ্যাগনেস?

—আরে হেমিংওয়ে যখন স্প্যানিশ সিভিল ওয়ার-এর আহত হয়ে হাসপাতালে ছিলেন তখন যে সুন্দরী তরুণী নার্সটি ওঁকে সেবা যত্নে ভালো করে তুলেছিলেন, সেই অ্যাগনেস। তাঁর সঙ্গে হেমিংওয়ের গভীর প্রেম হয়ে গেছিল। অ্যাগনেসও হেমিংওয়েকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। যদিও শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিল একবার। প্রেম আর শারীরিক সম্পর্ক তো সমার্থক নয়।

ওঁদের দুজনকে নিয়ে একটি অসাধারণ ছবি, মানে, টেলিফিল্ম দেখেছিলাম। সত্যিই অসাধারণ—একটি কবিতার মতো ছবি। একটি মাত্র ভুল বোঝাবুঝির জন্যে তাঁদের সেই প্রেম সার্থক হয়নি। অনেক বছর পরে অ্যাগনেস তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে এক নির্জনবাসে গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটি ছোট হ্রদের পাশের বাংলোতে হেমিংওয়েকে খুঁজে পান। দেখা হয় কিন্তু একটিও কথা হয় না। দুজনেরই দুরন্ত অভিমান একে অন্যের উপরে। অ্যাগনেস সেখান থেকে ফিরে আসেন।

টেলিফিল্ম এর সেই নির্জনবাসটি দেখে আমার মনে হয়েছিল ওই রকম একটি বাড়িতে আমি থাকতে পেলে আমিও লেখক হতে পারতাম। ওসব দেশের মানুষদের সৌন্দর্যজ্ঞান ও নির্জনতাপ্রীতি দারুণ। আমাদের শেখার।

তারপর বলেছিল, জানি না, কাকার সঙ্গে ইসাবেলার কখনও দেখা হবে কী না! হতেও তো পারে। এই আশাতেই আমি কাকাকে খুঁটির

কাছে আমার এই মহুয়াডুংরীতে নিয়ে এলাম। তোদের ঈশ্বর যদি সদয় হন তাহলে ওঁদের দেখা হয়েও যেতে পারে কোনোদিন।

তমালদা তারপরে একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, পশ্চিমি জগৎ থেকে আমাদের শেখার অনেক কিছুই আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি করে আমার চোখে যা পড়েছে তা হল স্বাবলম্বনের শিক্ষা। আর দ্বিতীয়ত নিজেকে ভালোবাসার শিক্ষা। কোনো আঘাতই নিজের জীবনকে উপভোগ করার পথে বাধা হয় না ওদের। কোনো আঘাতই জীবনকে লন্ডভন্ড করে দেয় না। মানুষের জীবনে কাজই সবচেয়ে প্রথম প্রেফারেন্স, তার পরে আর সবকিছু। ওরা প্রেমে দিওয়ানা হয়ে পথে পথে লাফাঙ্গার মতো ঘুরে বেড়ায় না।

তারপরে বলেছিল, আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে, ওদের সব অনুভূতির অভিব্যক্তিই চাপা। আর নিজেদের বুকের মধ্যেই আনন্দ ও দুঃখকে ওরা সইতে ও বইতে জানে। চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে না। আলগা থাকা, আলাদা থাকা, অন্যের সব ব্যাপারে মাথা না গলানোতে, ওরা বিশ্বাস করে। কারও জীবনের প্রাইভেসি ওরা নষ্ট করে না। তাই একদিক দিয়ে দেখতে গেলে ওরা আমাদের চেয়ে অনেক পূর্ণ জীবনযাপন করে। ওরা আমাদের মতো সাংঘাতিক সেক্স-স্টার্ভডও নয়, বিশেষ করে শহুরে মানুষদের মতো।

অ্যাগনেস বা হেমিংওয়ে যদি বাঙালি হতেন তবে অন্যজনের ভাবনা ভেবে একা একা বাকি জীবন কাটিয়ে দিতেন। বিন্দাস হয়ে দেবদাস হয়ে যেতেন। ওদের যে সূক্ষ্মানুভূতি নেই তা নয়, তবে তারা সহজেই বলতে পারে "যানে দো কন্ডাক্টর"।

তমালদা আরও বলেছিল, কাকার মুখটি বড় খারাপ এবং প্রচুর গুলও মারেন। ভালো অবস্থাতেও মারেন, পাগল অবস্থাতেও মারেন। কিন্তু ওঁর কাছে বসে থাকলেই অনেক মণিরত্ন পাবি। জ্ঞানের খনি।

তবে গুহার বাঘের মতো নিজের মধ্যে নিজে গুটিয়ে থাকেন। ওঁর জ্ঞান বের করতে হলে একটু খোঁচাখুঁচি করতে হবে। অ্যানথ্রোপলজিস্ট হলে কী হয়, সাহিত্য, সংগীত এবং অন্য নানা ব্যাপারেই কাকার জ্ঞান অসীম। আমাদের তাজনা স্কুলে যে দশগ্রামের ছেলেমেয়েরা আসবে তাদের পরম সৌভাগ্য যে কাকাকে তারা গুরু হিসেবে পাবে। কাকা তো মুণ্ডারিও জানেন। মুণ্ডারি মিথোলজি, মুণ্ডারি গান এসব কাকার ঠোঁটস্থ।

তবে ভয় একটাই। অ্যালঝাইমারের রুগিরা যেমন করে, কাউকে না বলে কেবলই পালিয়ে যেতে চায়। কাকার পাগলামি আসার পরে তেমনই করেন। সব সময় চোখে চোখে রাখতে হবে।



●

আমাদের মেস-এর রাঁধুনি মুনরী, রান্নাটা ভালোই করে। আগে ডাল ভাত তরকারি ছাড়া বিশেষ কিছু জানত না। আর খিচুড়ি রাঁধত কোনোক্রমে। পাখি, গৈরিকা আর সুনয়নী এখন তাকে অনেক রান্না শিখিয়েছে। পাখি, বাগবাজারের মেয়ে, গৈরিকা সিলেটের আর সুনয়নী রাঁচীর। মহেন্দ্র সিং ধোনির পুরানো বাড়ির পাশেই তাদের বাড়ি। ধোনি বলতে অজ্ঞান। বাবা এ.জি. বিহার এ কাজ করতেন। এখন রিটায়ার করেছেন।

আজ রাতে শুয়োরের মাংস রান্না করবে মুনরী, খুব ঝাল দিয়ে। সঙ্গে স্থানীয় লাল চালের মিষ্টি ভাত। হাটের দিন মানেই ছুটির দিন। হাট থেকেই শুয়োরের মাংস কেনে ওরা। বুধাই আগে মাংস কিনে নিয়ে আগেভাগে ফেরে ডুংরীতে। ওরা সকলে হাটে স্থানীয় মানুষজন এবং ওদের ঝিরি, মুনরী ও ঝাঝা ও বুধাই-এর সঙ্গে হাটের দোকানের সামনে ছ্যাঁচা বাঁশের চৌপাইতে বসে শালপাতার দোনাতে করে হাঁড়িয়া আর তেলেভাজা খায়। রেবতী বলে, আমাদের জীবনীশক্তি দারুণ বলতে হবে। নইলে পোড়া মবিলে ভাজা ওইসব ফুলুরি, সাংঘাতিক ভাবে ফার্মেনেটড ওই হাঁড়িয়া খেয়েও বেঁচে থাকি!

রুরু বলে, আর ওই পুরানো ছেঁড়া মোজাতে ছাঁকা নানা হাটের চা খেয়েও আমরা এতদিন বেঁচে আছি না, এও তো আশ্চর্য।

রোজই যে মুনরীই রাঁধে এমন নয়। রুরু খুব ভালো পর্ক ভিণ্ডালু রাঁধে। সেও রাঁধে মাঝে মাঝে। কোনো বিশেষ দিনে, যেমন মহাষ্টমী

বা কালীপুজোর রাতে বা পয়লা বৈশাখে পাঁঠার মাংসও খাওয়া হয়। পাঁঠার মাংসের খুব দাম। এখানের সাধারণ-অসাধারণ কোনো মানুষের পক্ষেই কেনা সম্ভব নয়, তাই হাটে পাঁঠার মাংস বলতে গেলে ওঠেই না। ওরা কোনো গ্রামে বা পাইকারদের বলে তিন চার কেজি ছোট পাঁঠার বন্দোবস্ত করে। জ্যান্ত পাঁঠা। মেয়েরা 'ম্যাগো' 'ম্যাগো' করলেও খায় জম্পেস করে। পাঁঠা কাটে বুধাই আর ঝাঝা। ডুংরীর পেছন দিকের মস্ত পাকুড় গাছের নীচে, পুটুস ঝোপের মধ্যে। তারপর রুরু রাঁধে আচ্ছা করে ঠেসে শুকনো লঙ্কা, আদা, পেঁয়াজ, রসুন বাটা দিয়ে। মধ্যে বড় বড় চন্দ্রমুখী আলু ফেলে দেয় আধখানা করে কেটে আর ঋদ্ধিরা সকলে আহা! আহা! করে খায়। তমালদা পাঁঠার মাংস খেতে খুব ভালোবাসে এইভাবে রান্না হলে। মেয়েদের মধ্যে সকলেই এক এক দিন রাঁধে। ওদের রন্ধনরতা মূর্তিটি ভারি ভালো দেখে ঋদ্ধি। উনুনের আঁচে গাল লাল হয়ে যায়, কপালে ঘামের রেখা ফোটে, ব্লাউজ বগলতলির কাছে ভিজে ওঠে। হাতা-খুন্তি হাতে ওদের সেই রূপ দেখে মুহূর্তের জন্যে মনে হয় নারীমাত্রই মহামায়া, কল্যাণী।

ভালো দেখে বটে কিন্তু সেই ভালোলাগা মনে মনেই থাকে। কাউকে বলতে পারে না। পুরুষ বা স্ত্রী সকলের মনেই অনেক কথা ফোটে কিন্তু সেসব কথা বাইরে আনা যায় না।

ঋদ্ধি ভাবে ভাগ্যিস আনা যায় না, বা আনে না, আনলে সে নিজেই বড় রিক্ত হয়ে যেত হয়ত।

রাতে ভালো মন্দ মাংস খাওয়া হবে বলে, ছুটির দিনে হাটবারের দুপুরের খাওয়া খুব সিম্পল হয়। আজ হয়েছিল অড়হড়ের ডাল, লাউ এর চোকা, মুরগির ডিমের ঝোল—কারিপাতা দিয়ে।

অনেকগুলো কারিপাতার গাছ আছে রান্নাঘরের পেছনেই। লেবুও হয় পর্যাপ্ত। গন্ধ লেবু এবং পাতি লেবুও। কাঁচা লঙ্কাও হয় ওদের কিচেন গার্ডেনে, পুদিনা পাতাও হয়।

আজকে কোন হাটে যাবি?

হাত চাটতে চাটতে রেবতী বলল।

ঠিক কর। সকলে যেখানে যাবে সেখানেই যাব।

গৈরিকা বলল, আমার শরীর খারাপ। বাস থেকে নেমে আমি বেশিদূর হাঁটতে পারব না কিন্তু। আগেই বলে দিলাম।

বৃষ্টিতে ভিজে তোর জ্বর হয়েছে বুঝি?

ঋদ্ধি বলল।

নাঃ।

বিরক্তির সঙ্গে বলল গৈরিকা।

বিরক্তির কারণ বুঝতে না পেরে ঋদ্ধি চুপ করে গেল।

বিশাল কাকার খাবার তাঁর ঘরে পৌঁছে দিয়েছে বুধাই।

কোন হাটে যাবি ঠিক কর। এবার রুরু বলল।

সে ঠিক করা যাবেখন। খেয়েদেয়ে একটু গড়িয়ে তো নিই। কোনো হাটই তো চারটের আগে লাগবে না।

অরণি বলল।

অরণি নতুন এসেছে গামহারডুংরীতে। খুব গভীর ছেলে। নানা বিষয়ে অনেক পড়াশুনো আছে। তমালদা সে জন্যে ওকে খুবই পছন্দ করে।

তা ঠিক।

রুরু বলল।

খেয়ে উঠতে উঠতে পাখি বলল, চল, আজ সাইকোর হাটে যাই।

ঠিক আছে। যা ঠিক করবি তোরা। ঋদ্ধি বলল।

সাইকোর হাটে অনেকগুলি কাঁচের চুড়িওয়ালি আসে। ভালো স্টক আছে চুড়ির। ফুলেল তেলও আসে। শ্যাম্পুও।

ফাজিল রুরু বলল, বুলাদিও আসে। নতুন বেরোনো, বেশি আরামের কনডোম নিয়ে।

রেবতী বলল, আড়চোখে পাখির দিকে চেয়ে, আমাদের প্রবলেমটা অন্য।

কী?

প্রয়োগ ক্ষেত্রর অভাব।

পাখির গাল লাল হয়ে গেল। চোখ বড় বড় করে বলল, তমালদাকে বলে দেব কিন্তু।

আহা! বলাবলির কী আছে! গতমাসে যখন কলকাতাতে গেছিলাম তখন বোনের বাড়ি গেছিলাম। আমি আর বোন-ভগ্নিপতি আলোচনা করছিলাম আমাদের এক পিসতুতো দাদা-বউদিকে নিয়ে, তাদের চার-চারটি বাচ্চা অথচ ছাপোষা চাকরি করে একটা। আমাদের আলোচনা বারান্দাতে বসে শুনেছিল চার বছরের ভাগ্নি। সে দৌড়ে এসে বলল, আচ্ছা মা, পিসেরা নিরোধ খেয়ে নেয় না কেন?

ভাগ্নির কথা শুনে আমরা হেসে বাঁচি না। তুই দেখছি আমার ভাগ্নির চেয়েও ছোট। তোর বয়স কত হল রে? সাড়ে তিন?

মেয়েরা মেয়েদের ঘরে চলে গেল। নিজেদের ঘরে পৌঁছাবার পরে রুরু বলল ঋদ্ধিকে, তুই দিন দিনে একটা ইডিয়ট হচ্ছিস—একটা ঢেঁচুয়া।

—অবাক হয়ে ঋদ্ধি বলল, কেন?

—কোনো মেয়ে যখন বলে তার 'শরীর খারাপ' তখন তা নিয়ে জেরা করতে নেই। মেয়েদের শরীর অনেক কারণে খারাপ হতে

পারে। কী শরীর খারাপ? তা নিজেই না বললে তার কাছে জানতে চাইতে নেই। সেটা অসভ্যতা।

—আরে অত মনে থাকে না কি? ভুল হয়ে গেছে আমার। আর হবে না।

রুরু বলল, এই রেবতী, একটু গড়িয়ে তো আমরা সকলেই নেব। কিন্তু তুই তো পায়জামার দড়ি ঢিলে দিয়ে তোর পাশবালিশ জড়িয়ে কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমুবি। আমরা কিন্তু ঠিক তিনটেতে বেরোব। পিচ রাস্তাতে নেমে বাস ধরে সাইকো পৌঁছাতে পৌঁছাতে চারটে বেজে যাবে।

ঋদ্ধি বলল, অত কথার কী আছে? আমরা কি ওর শালি নাকি? ঠিক তিনটের সময় কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে নিয়ে ওর কানে ঢেলে দিলেই হবে। রোজ রোজ ওর এই জমিদারি কায়দা ভালো লাগে না আমার।

জল ঢেলেই দেখ না কী হয়।

সিরিয়াসলি বলছি, ঋদ্ধি বলল। আজকে আমাদের সঙ্গে বিশাল কাকা যাবেন।

পাগল বলে কথা। পেডিগ্রি কুকুরেরও বকলেস হঠাৎ খুলে দিলে সে কোন দিকে দৌড় দেয় তা তো বলা যায় না। সেই হ্যাপা আমাদেরই সামলাতে হবে।

ছিঃ।

রুরু বলল।

একজন মেন্টালি অ্যাফ্লিক্টেড মানুষ সম্বন্ধে অমন কথা বলাও পাপ। তমালদা শুনলে ভারি দুঃখ পাবে। বিশাল কাকা শুনতে পাবেনই।

—পাগলের আবার সুখ-দুঃখ।

—তুই বড় সিনিক হয়ে গেছিস ঋদ্ধি।

—বিরক্তির গলাতে ঋদ্ধি বলল, দ্যাখ, আমার এসব কথা ভালো লাগে না।

—কেন? এতে ভালো না লাগালাগির কী আছে?

—আছে? আমার বাবা আজ সাতবছর হল পাগল তা কি তোরা জানিস? বাবার জন্যে ছোটবোনটাকে বিয়ে দিতে পারছি না। একটি শিক্ষিত ওয়েলসেটলড ছেলে ছ'বছর নেকু-নেকু প্রেম করে ব্যাক-আউট করে গেল, বলল. তার গার্জেন বড়মামা বলেছেন, পাগলের মেয়ের পাগল হবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

রেবতী বলল, তোর বোনের কিছু হবে না কারণ তার দাদাই তো বাবার জিন পেয়ে গেছে।

মানে?

অবাক হয়ে বলল ঋদ্ধি।

মানে আবার কী? তুই। তুইও তো পাগল।

ঋদ্ধি রেগে উঠে বলল, তুই একটা কেরকেটো ঢেঁচুয়া। আমাদের পাগলের বংশ বলছিস?

রুরু বলল, প্লিজ তোরা দুজন বাইরে গিয়ে কাজিয়া কর। একটু ঘুমিয়ে নিতে দে।

তারপর ঋদ্ধিকে বলল, আরে ঝাঝাকে বলেছিস ঠিক তিনটে বাজতে দশ-এ আমাদের চা দেবে।

হ্যাঁ হ্যাঁ বলে দিয়েছি খাওয়ার সময়েই। আমার কর্তব্যজ্ঞান আছে।

—রেবতী পাশ ফিরে বলল, আচ্ছা তাই তো। বিশাল কাকা যাবেন আমাদের সঙ্গে, তমালদাও যাবে। যদি ইসাবেলার সঙ্গে দেখা

হয়ে যায় বিশাল কাকার, কেমন রোমান্টিক ব্যাপার হবে ভেবেছিস কি তোরা কেউ?

কথাটা মন্দ বলিসনি। ঘটনা-দুর্ঘটনা যে-কোনো সময়েই ঘটতে পারে। সিচুয়েশান ইজ প্রেগন্যান্ট উইথ এক্সপেকটেশান।

—বিশাল কাকার খাওয়াটা কেউ তদারকিও করলাম না আমরা।

—তমালদা নিজেই করেছেন।

—তাই? ফার্স্টক্লাস।

—এবার কথা বন্ধ কর।

—ইয়েস।



●

ওই দ্যাখ, ওই পাহাড়টার নাম গাড়িকাদুরাংবুরু।

রুরু বলল, রেবতীকে।

রেবতী 'গামহারডুংরী'তে এসেছে মাস কয়েক হল। ওদের মধ্যে ওরই একমাত্র বটানি ছিল। বটানি নিয়ে এম.এস.সি পড়েছে রাঁচী ইউনির্ভাসিটি থেকে। রেজাল্ট খুবই ভালো করা সত্ত্বেও এবং ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক সোসাইটি থেকে একটি বৃত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও ও তমালদার ডাকে সাড়া দিয়ে এখানে চলে এসেছে। রেবতীর বাবা অত্যন্ত আদর্শবান পুরুষ। ওর ঠাকুর্দা বিপ্লবী ছিলেন। বুড়িবালামের তীরে সাহেবদের সঙ্গে যে লড়াই হয়েছিল সেই বিপ্লবীদের দলে ছিলেন তিনি। তমালদাকে বাবা ছেলেবেলা থেকে চিনতেন এবং অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তমালদাও নাকি টাটা কোম্পানিতে অত্যন্ত ভালো চাকরি পেয়েছিল। পড়াশোনাতে তো ভালো ছিলই তার ওপরে খুব ভালো ক্রিকেটও খেলত। মহেন্দ্র সিং ধোনি ওঁর চেলা ছিল বাচ্চা বয়সে। রুসী মোদি ডেকে ওঁকে চাকরির অফার দেন কিন্তু তমালদা মোদি সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়ে 'না' করে দেন। তারপর এম. সি. সি.তে ভিড়ে যান। তারও পরে এই 'গামহারডুংরী'র হাতছানিতে এখানে এসে পড়েন। এখানের সব মানুষ তাকে ভালোবাসে, ভক্তি করে।

রেবতী নতুন এসেছে বলেই স্থানীয় সব জায়গা ওকে চেনায় সকলেই অযাচিতভাবে। উদ্ভিদতত্ত্ব সম্বন্ধে ওর কাছে ট্যাঁ-ফোঁ করতে পারে না বলেই অন্যান্য বিষয়ে পণ্ডিতি করে।

এবার ঋদ্ধি বলল রুরুকে, গাড়িকাদুরাং মানে জানিস?

না, কী?

মানে হনুমান। বুরু মানে পাহাড়। একসময়ে ওই পাহাড়ে অনেক হনুমান ছিল তাই ওর নাম গাড়িকাদুরাংবুরু।

বাস থেকে নেমে ওরা সাইকোর হাটের দিকে চলেছিল। তমালদা ও বিশাল কাকাও চলেছেন ওদের সঙ্গে।

এদিকেই তো বিরসা মুণ্ডার বাড়ি ছিল না?

রেবতী বলল।

ছিল তো। ভগবান বিরসা মুণ্ডা। এইখানেই সেই বিশ্ববিখ্যাত খ্যাত উলগুলান এর জায়গা। ওই দ্যাখ ওই পাহাড়টার নাম মহাড়াওড়া আর তার পরেই বিরসা মুণ্ডার সুকানবুরু পাহাড়।

পাখি বলল, এখানের মেয়েরা একটা গান গায়, কোনো ছেলে যদি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়।

রেবতী বলল, কী গান?

"আয়ো ঘরে বাবা ঘরে।

রিঙ্গিচিঙ্গি-চিকনপিণ্ডা

ছুটত নই আওয়ে

বাপকা প্রেমসে, ভাইকা প্রেমসে ছুটত নই আওয়ে।"

—মানে?

—মানে হল, আমার বাবা-মায়ের ঘর যে খুবই সুন্দর—ঝকঝকে তকতকে, ইংরাজিতে যাকে বলে Spic and Span—রিঙ্গিচিঙ্গি-চিকনপিণ্ডা। তাই বাবার স্নেহ ছেড়ে, ভাইয়ের ভালোবাসা, আমার ঝকঝকে তকতকে ঘর ছেড়ে আমি নারী আসতে কি পারি?

তারপর বলল, সুকানবুরু পাহাড়ে বিরসা মুণ্ডার মন্দির আছে। সাইকোতে তো হাট বসেই সেন্ড্রাতেও হাট বসে প্রতি রবিবার।

বন্দগাঁওতে হাট বসে প্রতি বুধবার—মস্ত হাট। আবার বন্দগাঁও এর কাছে গুলুতেও হাট বসে প্রতি শুক্কুরবারে।

—পাখি বলল, আবার যে মেয়ের বিয়ে ঠিক হল তাকে তার প্রেমিক গান গেয়ে বলে,

'সাসানউলি সাসানসুতাম
কাটা দোরেমরাঙ্গানজানা'

—মানে হল, আগে তো খুব বলেছিলে বিয়ে করবে না, এখন দেখছি বেশ তো হাতে আমের পাতা আর হলুদ ছোপানো সুতো বাঁধা হয়েছে. পা পরিষ্কার করে নখ কেটে, পায়ে আলতাও পরা হয়েছে দেখি।

তার উত্তরে হাসতে হাসতে মেয়ে বলে—

'এনঙ্গানিকো জুড়িয়াইনা তেরেদোরেংখোলোংযানা
আপুনেকো জোকাইখানা কাটাদোরেঙ্গরাঙ্গাজানা'

—মানে হল, মা-বাবা আমার বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে তাইতো হাতে হলুদ ছোপানো সুতো পরেছি, বাবা বিয়ে দিচ্ছে বলেই তো পায়ের নখ কেটে আলতা পরেছি। ইঃ, তোমার জন্যে পরেছি থোরিই!

রেবতী বলল, বাঃ দারুণ তো। তা পাখি তুমি এতো সব গান শিখলে কার কাছ থেকে?

কেন মুনরীর কাছ থেকে। মুনরী আরও কত গান জানে। মুনরীর প্রেমিক থাকে তাজনা গ্রামে। ভারি সুন্দর ছেলে সে। সে মুরহুর লাক্ষা কোম্পানি আচ্ছুরাম কালকাফ-এ কাজ করে। খুব দায়িত্বের কাজ কারখানার মালিক সোহনলাল ব্যাহেল খুব পছন্দ করেন আনেকা মুণ্ডাকে। একদিন ওদের বিয়ে হবে। আনেকার ছোটবোনের বিয়ে এখনও হয়নি বলেই বিয়েটা আটকে আছে।

—তাই?

পাখি বলল, তাই তো!

হাটে ওরা যে-যার কেনাকাটা সারল। ঋদ্ধিরা তেলেভাজার দোকান থেকে তেলেভাজা খেল। মেয়েরাও খেল।

রুরু বলল, এই নে। বলে, ওদের সকলকে একটি করে জিনেটাক অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট দিল। বলল, পোড়া মোবিলে ভাজা এইসব অখাদ্য খেয়ে অম্বল হবে, রাতে আর শুয়োরের মাংস খাওয়া হবে না। একটা করে জিনেটাক অ্যান্টাসিড খেয়ে নে।

বিশাল কাকা আর তমালদা হাটের একপাশের একটি মস্ত বড় কালো পাথরের উপর বসে ছিলেন। পাথরটার পেছনে একটা প্রাচীন ঘোড়ানিমের গাছ। তারই ছায়া পড়েছে পাথরটার উপরে। ওরা ওঁদের তেলেভাজা দিয়ে এল।

বিশাল কাকা খুব শান্ত হয়ে বসে চারদিক দেখছেন। এ অঞ্চলে উনি বহুদিন কাটিয়েছেন। সম্ভবত অনেক পুরানো স্মৃতি ফিরে আসছে ওঁর মনে। পৃথিবীর সব প্রশান্তি এখন ওঁর মুখে। যেন প্রশান্ত মহাসাগর। কোনো চাওয়া নেই, খেদ নেই, ভূত-ভবিষ্যৎ কিছুই নেই, শুধু বর্তমান আছে।

এমন সময় একটি মুণ্ডা ছেলে এসে দু-হাত দিয়ে ওঁর দু-হাঁটু ছুঁয়ে ওঁকে প্রণাম করল। তারপর কী যেন বলল, বিশাল কাকাকে। বিশাল কাকার চোখদুটি হঠাৎই দপ্ করে জ্বলে উঠল। বেশ অনেকক্ষণ তার সঙ্গে নিচুগলাতে কথা বললেন বিশাল কাকা।

ঋদ্ধি তমালদাকে জিজ্ঞেস করল, কী বলছে ছেলেটি?

তমালদা গলা নামিয়ে বলল, পরে বলব।

একটা হলুদ বসন্ত পাখি ডাকতে ডাকতে হাটের উপর দিয়ে উড়ে গেল।

মুনরী বলল, ও পাখিকে আমরা বলি, সাল্লু মায়না। পাখিদের তোমরা সব অন্য নামে ডাক, আমরা অন্য নামে ডাকি।

পাখি বলল, কী রকম?

মায়না মানে তোমাদের ময়না, কেরকেটা মানে ছাতারে, আমাদের ডুংরীতে অনেক আছে। ছ্যা ছ্যা ছ্যা করে ডাকে না সব সময়ে। রুরু বলল, ইংরেজি নাম সেভেন সিস্টার্স দলের পাখি ওরা। ওরা গাছে থাকে না। মাটির উপরে সবসময়েই লাফিয়ে লাফিয়ে চলে আর সর্বক্ষণই ডাকে। ঢেঁচুয়া হচ্ছে ফিঙ্গে, রিচ্চি হল বাজ, তোঁয়াশা হল বড়কি ধনেশ আর তোঁয়াল হল ছোটকি ধনেশ। কাওয়া বা দাঁড়কাক হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে সম্মানিত পাখি। যখন গোঁড় ধান ওঠে ভাদ্রতে, হাঁড়িয়া খাওয়া হয় আর নবান্ন উৎসব হয়, তখন খুটকাট্টি ভূতের পুজো করে আমরা গান গাই।

—গেয়ে শোনাও না একটু।

'কেরকেটা জাগুয়া ঢেঁচুয়া মারু
সোনালেকা দিশামদো, রূপালেকা গামায়দো
বারো ভাই হাসুরকো তেরো ভাই দেওতাকো
নিদাকে সিপুদেরে সিঙ্গিকো হোপায়কা
সিঙ্গুকে সিপিদেরে নিদাকো হোপায়কা...' ইত্যাদি
অনেকই লম্বা গান।

সাইকোর হাটে ঘুরতে ঘুরতে বেলা পড়ে এল। এবার হাঁড়িয়া খাওয়ার সময়। হাঁড়িয়ার দোকানের সামনে মাটিতে বসে শালপাতার দোনাতে করে ওরা সবাই হাঁড়িয়া খেল। কেউ কেউ দ্বিতীয় রাউন্ড।

হঠাৎ বিশাল কাকা বলে উঠলেন,

'দারু পিয়াতো ক্যা বাফা?

দিল খুশ ঔর পেট সাফা।
আফিং পিয়াতো ক্যা বাফা?
গাঁড় তংক ঔর দিল খাফা।'

বলে, নিজেই জোরে জোরে হাসতে লাগলেন।

তমালদা মেয়েদের সামনে একটু অপ্রতিভ হলেন।

রুরু বলল, মানে কী হল কাকা?

আরে, মানে হল, মদ খেয়ে কী লাভ হয়? পেট পরিষ্কার হয় আর মনে আনন্দ হয়। আর আফিং খেয়ে কী লাভ হয়? পেট টাইট হয়ে যায় আর মেজাজ খিঁচড়ে থাকে।

ওরা সকলেই কাকার এমন হঠাৎ বিস্ফোরণে খুব জোরে হেসে উঠল। কাকা নিজেও হাসছিলেন। পাগলদের হাসিতে কোনো ভেজাল থাকে না। সে হাসি সরল হাসি।

তবে যেসব মানুষ পাগল হবার আগেও কুটিল থাকে তাদের হাসিও বক্র হয়। ঋদ্ধি তিন চারজন পাগল দেখেছে খুব কাছ থেকে, তাই সে জানে।

সাইকোর হাটে যাবার জন্যে তারা যখন বাস থেকে নেমেছিল তখন আকাশ একেবারে পরিষ্কার ছিল, আকাশের দশ দিকে মেঘের কোনো চিহ্নও ছিল না। কিন্তু বেলা পড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আকাশ ক্রমশই কালো হয়ে উঠছে। বুধাই শুয়োরের মাংস কিনে নিয়ে আধঘণ্টাটাক আগে চলে গেছে। গিয়ে, মাংস পরিষ্কার করে কেটে কুটে রান্নার জন্যে রেডি করবে। রান্না করবে মুনরীই, আর ঝাঝা সাহায্য করবে তাকে। ও হাঁড়িয়া টাঁড়িয়া খায় না—তবে গ্রামে বিয়ে বা অন্য কোনো উৎসব থাকলে খায়, নইলে নয়। মানুষটা একটু সাত্ত্বিক প্রকৃতির। গামহারডুংরীর ঈশান কোণে একটি প্রাচীন

অশ্বত্থগাছ আছে সেখান থেকে ডুংরী খাড়া নেমে গেছে উপত্যকাতে এবং উপত্যকার সেই অংশ একেবারে বিশ্বটাঁড়। তাজনা নদীর চিকচিকে জল দেখা যায় সেখানে দাঁড়িয়ে। রোজ সকালে বুধাই চানটান করে ওই অশ্বত্থ গাছের কোটরে যে কিচি-গাড়াং দেবতার ভয়াবহ মূর্তি আছে তাকে পুজো করে ফুলপাতা দিয়ে তারপর দিগন্তে ধীরে ধীরে ওঠা সূর্যকে প্রণাম করে তাজনা নদীর দিকে চেয়ে। একজোড়া মস্ত প্রাচীন গোখরো সাপ আছে নাকি সেই দেবতার থানের কাছে। বুধাইই ওদের বলেছিল। মুনরী আর ঝাঝা নাকি ওর সঙ্গে গিয়ে একদিন দেখেও ছিল। সাপেরা দেবতার থান পাহারা দেয়। মস্ত লম্বা লম্বা সাপ।

তবে মুনরী আর ঝাঝার মতে সে দুটি গোখরো সাপ নয়। কী সাপ তাও তারা বলতে পারেনি। শুধু বলেছিল, কুচকুচে কালো রঙের আর প্রায় আট দশ হাত লম্বা। ফণা ধরে যখন দাঁড়ায় তখন মানুষের মাথার সমান উঁচু হয়। ছোবল দিলে একেবারে মাথায় ছোবল দিতে পারে। ওই সাপেরা কাউকে কামড়ালে তার বাঁচার আশা একেবারেই নেই।

ওরা সকলেই হাঁড়িয়া খায় বটে, কখনও কখনও মহুয়াও, তবে নেশা হওয়ার মতো খায় না। তমালদা একদিন বলেছিল, রবীন্দ্রনাথের রবিবার গল্পে সেই আছে না? নায়ক অভি বলছে নায়িকা বিভাকে, যে, আমি কোনো নেশাকে পেতে পারি কিন্তু কোনো নেশা আমাকে পাবে সেটি হচ্ছে না।

বিশাল কাকা উদাস চোখে চাইছেন চারদিকে শালের দোনাতে হাঁড়িয়াতে চুমুক দিতে দিতে। তাঁকে সেই মুহূর্তে দেখে মনে হচ্ছে তাঁর মতো সুখী মানুষ এই পৃথিবীতে আর বেশি নেই। কারও উপরেই তাঁর কোনো রাগ নেই, অভিমান নেই, কারও অপমানই যেন তাঁর

গায়ে লাগে না। পরতের পর পরত মেঘ জমা ক্রমশ কালো হয়ে আসা আকাশের দিকে উদাস চোখ মেলে বসে আছেন কাকাবাবু।

এমন সময়ে একটি মুণ্ডা ছেলে এসে তমালদাকে জিজ্ঞেস করল, মুনরী আজ আসেনি কি বাবু?

তমালদা বলল, এসেছে তো। ওইখানে গিয়ে দেখ, হাঁড়িয়ার ঠেকএ পাবে।

তমালদা আর কাকাবাবু যে পাথরে বসেছিলেন সেখানে তাদের জন্যে হাঁড়িয়া নিয়ে এসেছিল ঋদ্ধি। এই তৃতীয় রাউন্ড।

তমালদা বলল, আর বেশি দেরি কোরো না তোমরা, চল, এবার ওঠা যাক। কাকাকেও আর দিও না। বাস-স্ট্যান্ড অবধি অনেকখানি হাঁটতে হবে তো। কাকার অসুবিধে হবে। আকাশের অবস্থা তো দেখছ।

হুঁ।

মুণ্ডা ছেলেটির পেছনে ঋদ্ধিও চলল হাঁড়িয়ার ঠেক-এর দিকে। হাটে এইরকম চারপাঁচটা ঠেক হয়েছে। মিশ্র গন্ধ বেরুচ্ছে পায়ে পায়ে ওড়া ধুলো থেকে। এই ছেলেটি মুনরীর স্বামী ছিল। ওরা ‘সাকামচারি’ করে আলাদা হয়ে গেছে। সাকামচারি মানে, ডিভোর্স। সাকামচারি করেছে বটে কিন্তু বিন্দুমাত্র তিক্ততা নেই দুজনের মধ্যে। হাটে এলে একসঙ্গে বসে হাঁড়িয়া খায়. বিড়ি খায়, হাসি-তামাশা করে। তারপর মুনরী তার রঙিন ব্লাউজের ভিতরের সুডৌল দুটি সুগন্ধি বুকের মধ্যে খাচ্ছিল। হাত ঢুকিয়ে টাকা বের করে হাঁড়িয়ার পয়সা দেয়। কোনোদিন বা ছেলেটিও দেয়। ছেলেটির নাম ডুইক্যা।

মুনরী মুরহু গ্রামের বোগোট নামের একটি ছেলের সঙ্গে বসে হাঁড়িয়া খাচ্ছিল। কিছুদিন হল দেখছে মুনরীর সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে

বোগোটের। ভাব ভাব কদমের ফুল। কে জানে। হয়ত বিয়ে হবে ওদের। নাও হতে পারে।

একদিন পাখি জিজ্ঞেস করেছিল মুনরীকে, সাকামচারি দিলি কেন রে ডুইক্যাকে?

মুনরী ঝর্নার মতো হেসে বলেছিল, মরদটা মানুষ ভালো কিন্তু বড় হড়বড় খড়বড় করে।

' মানে?

মানে, আদর করবার সময় বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। তুমি তো বিয়ে করনি পাখি দিদি, তুমি ওসব বুঝবে না। গায়ের জোর থাকলেই মবদ মরদ হয় না, মরদের মতো মরদ হতে হলে অনেক শোচ-সমঝ লা:গে। ধীর স্থির হতে হয়। সব কিছুই ধীরে সুস্থে করতে হয়। মরদের অনেক রকম হয় গো দিদি।

মুনরীর কথা কিছুটা বুঝেছিল, কিছুটা বোঝেনি পাখি। চুপ করেছিল। ভাবছিল, অনেক কথা। ভাবছিল জীবনের অনেকই সমস্যার কত সহজে মুখোমুখি হয় এরা আবার কত সহজে তার সমাধানও করে। ওদের কাছ থেকে পাখিদের অনেকই শেখার আছে।

ঋদ্ধি দেখল, ডুইক্যা গিয়ে মুনরী আর মুনরীর নতুন বন্ধু বোগোটের সঙ্গে হাঁড়িয়া খেতে বসে গেল। বোগোট একটা বিড়ি এগিয়ে দিল ডুইক্যার দিকে। ডুইক্যা গাছোয়াল। মানে অনেক পলাশ গাছের মালিক। পাইকারদের বছরের চুক্তিতে পলাশ গাছ বিক্রি করে দেয়। সেসব গাছ থেকে লাখি বা লাক্ষা জড়ো করে তারা আচ্ছুরাম কালকাফ এর কারখানাতে বিক্রি করে দেয়। লাহি শুধু পলাশ গাছেই হয় না, কুল গাছে, কুসুম গাছে আরও অনেক গাছেই হয়। লাহির জন্যে যারাই গাছ করে তাদেরই বলে গাছোয়াল।

তমালদা বলছিল এই আচ্ছুরাম কলকাতায় একটি জার্মান কোলাবরেশানের কোম্পানি। ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় লাক্ষা রপ্তানি কারক তারা। ওই মুরহুতে তাদের কারখানার অঞ্চলটির নামই আচ্ছুরামপরী। ওরা ছাড়াও এ অঞ্চলে সমর সিং জয়সোয়ালরাও আছেন। তাঁদের কারখানাতেও অনেক মেয়ে-মরদ কাজ করে।

মুরগি লড়াইও শেষ হয়ে এল।

এই যে মুনরী আর ডুইক্যার সাকামচারি যে হল তা দিল পঞ্চায়েত। দুজনের বক্তব্য সব শুনেটুনে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে পঞ্চায়েতের সদস্যরা 'মিয়াদ পাটিরে কাকিং গিটিটা না' বলে দিল ওই বাক্যটির মানে হল, এরা দুজনে এক মাদুরে শোয় না। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক যে নেই তা তারা বুঝে যায়। কিন্তু শারীরিক সম্পর্কেও আসল হল মন। মন যদি সরে যায় তাহলে শরীরও চায় না শরীরকে। দাম্পত্যে যে শারীরিক সম্পর্ক কতখানি জরুরি তা এই মুণ্ডারা শিক্ষিত মানুষদের চেয়ে অনেক সহজে বুঝেছে এবং মেনেও নিয়েছে।

ঋদ্ধির মনে হয়, অবিবাহিত হয়েও 'গামহারডুংরী'তে আসার পরে সে অনেক কিছু জেনে গেল। অনেক সাবালক হয়ে গেল। এই আদিবাসীদের উন্মুক্ত সহজ-সরল জীবনযাত্রা এবং জীবনবোধ থেকে মধ্যবিত্তদের অনেক কিছুই শেখার আছে। মধ্যবিত্তদের লোকভয়, লোক-দেখানো ব্যাপার-স্যাপার, সমাজ নামক বাজপাখিকে অহেতুক ভয় তাদের জীবনের অনেক কিছু থেকেই বঞ্চিত করে। অথচ তাদের সমাজ তাদের কিছুমাত্রই ফিরিয়ে দেয় না মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষদের। অনেকেই সময় মিছিমিছি বেঁচে, তারা মিছিমিছি মরে।

এবারে হাট ভাঙবে। আরও ঘণ্টা দুয়েক চলত, কিন্তু আকাশের অবস্থা দেখে ক্রেতা ও বিক্রেতা সকলেই পাট গুটোচ্ছে। মেয়েরা

হরিণীর মতো গতিতে, দারুণ সাজুগুজু করে হাটে এসেছিল আসার সময়ে। কারও পরনে পলাশ রঙা শাড়ি, কারও পরনে কচি কলাপাতা রঙা সবুজ শাড়ি, কারও শাড়ি ফলসাবরণ, করৌঞ্জ বা নিমের তেল মাখা, চুলে কখনও পলাশ, কখনও কুর্চি, কখনও হুন্দি, কখনও কুসুম, কখনও বা হুড্ডুন্দা ফুল গোঁজা, গলাতে সাতনরী হার, পায়ে মল, নাকে নোলক, কারও পায়ে পায়জোর, কারও পায়ের আঙুলে চুটকি।

এবারে মিলন মেলা ভাঙল আজকের মতোন—আবার বসবে সাতদিন পরে।

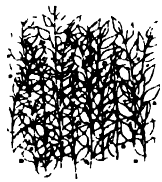
ঋদ্ধিরা এবার সবাই ফিরে চলেছে পিচ রাস্তার দিকে। প্রত্যেকের হাতেই একটি করে চটের থলে। তাতে কিছু না কিছু জিনিস। বেশির ভাগই তরিতরকারি। চাল, ডাল, তেল। সাতদিনের মতো। নিজেদের, আর হঠাৎ অতিথি এসে গেলে, তাঁদেরও রসদ।

রেবতী মুরগি কিনেছে চারটে। গৈরিকা মুরগির ডিম। খড়ের মধ্যে বসিয়ে নিয়েছে ছ-ডজন। নিজের নিজের টাকা থেকে কিনেছে। কিন্তু কাল সকালেই বুধাই সকলকে রি-ইমবার্স করে দেবে 'গামহারডুংরী'র ফান্ড থেকে। বৃষ্টির ঝালর ধেয়ে আসছে গাড়িকাদুরাংবুরু পাহাড়ের ওপর থেকে।

ওরা সকলে দৌড়োতে লাগল। পিচ রাস্তার পাশে একটা মস্ত তেঁতুল গাছ। অনেকেই তার নীচে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। হাটবারে বাস অন্যদিনের তুলনাতে তাড়াতাড়ি আসে, তবে সেই তাড়াতাড়িই যথেষ্ট তাড়াতাড়ি নয়। তমালদা কাকাবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আস্তে আস্তে আসছে। মানুষটা তিনবছর পাগলা গারদে থাকাতে তাঁর মন যেমন বিস্রস্ত হয়ে গেছে তেমন হয়ত শরীরও। বয়স মোটে পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন হবে কিন্তু কেমন যেন নড়বড়ে হয়ে গেছেন। চলাফেরা না করে জোরে হাঁটতে কষ্ট হয়।

টোকা ওরা কাজ করার সময়ে অথবা এমনিও পরে 'গামহারডুংরী'তে। কিন্তু হাটবারে কেউই নিয়ে আসে না। কেউ কেউ কায়দাওয়ালা সান-গ্লাস পরে, অনেকেই জিনস। মেয়েরাও পরে কেউ কেউ। উপরে টপস। ছেলেরা আডিডাস বা নাইকের গেঞ্জি। রিঙ্গিচিঙ্গি চিকনপিণ্ডা হয়ে ঝিংচ্যাক পোশাক পরে তারাও হাটে আসে। তাদের দেখার মানুষের অভাবও ঘটে না। মুরহুর ইন্ডো জার্মান শেল্যাক কারখানা আচ্ছুরাম কালকাফ কোম্পানির অনেক বাঙালি কর্মচারীরাও আসেন। তবে তাঁদের মেয়েরা আসেন না আদিবাসী মেয়েদের মতন। সেই মধ্যবিত্ত সিনড্রোম। শুধু মুসলমান সমাজেই নয়, বাঙালি মধ্যবিত্তসমাজেও নারী স্বাধীনতা আসতে এখনও অনেকই দেরি। পুরুষেরাই তাদের দাবিয়ে রাখেন।

সাতদিনের মধ্যে এই একটি দিনেই ক্লাব-এ যাওয়ার মতো ওরা সকলে মিলে আসে হাটে। শুধু সাইকোর হাটেই নয়, ঘুরে-ফিরে তাজনা, কুন্দ্রুগুটু, গুলু এবং অন্যান্য হাটেও যায়।



ওদের সকলের খাওয়া হয়ে গেছে। বৃষ্টিতে চুপচুপে ভিজে গামহারডুংরীতে ফিরেছিল। জামা-কাপড় বদলে, খেয়েছে। আজ মুনরী রাঁধেনি শুয়োরের মাংস, সুনয়নী রেঁধেছিল। তার জ্যাঠামশায় শিকারি ছিলেন। মাঝে মাঝেই শুয়োর মেরে তার মাংস আনতেন। সেই জন্যেই সুনয়নী শুয়োরের মাংসটা ভালো রাঁধে।

সারাটা দিন ওদের কাজে-কর্মে কাটে। সন্ধে নামার পরেই সময় যেন ভারী হয়ে বসে ওদের সকলেরই ওপরে। এখানে ইলেকট্রিসিটি নেই। ডুংরীর নীচেই একটি তালাও আছে—সেখান থেকে হ্যান্ড পাম্পে জল তুলে ডুংরীর সবচেয়ে উঁচু জায়গাতে পলিথিনের একটি ট্যাঙ্কে জল ওঠানো হয়। তাতে প্রতি সপ্তাহে পটাশ পারমাঙ্গানেট দেওয়া হয়।

টিভি একটা রাখা যেত, ব্যাটারি-চালিত, কিন্তু তমালদা রাখেনি। ট্রানজিস্টর রেডিওতেই সকাল সন্ধের খবর এবং গান শোনে ওরা। যারা শুনতে চায়। গৈরিকা রোজ সকালে রবীন্দ্রসংগীত শোনে। রুরু এফ এম-এ ঝিংচ্যাক গান শোনে এই সব নতুন নতুন ব্যান্ডে এমন সব ঝিংচ্যাক গান হয় যে ঋদ্ধি বলে, ভল্যুম কমিয়ে দে। এইসব ব্যান্ডই বাংলা ভাষাটাকে গলা টিপে মারছে। বাংলা ভাষায় এমনিতেই ভীষণই বিপদ, তার অস্তিত্বের সংকট এতখানি গভীর আগে কখনওই হয়নি কিন্তু ঠিক সেই সময়েই বেশি প্রচার যেসব প্রিন্ট মিডিয়ার তারাই উঠে পড়ে লেগেছে সেই সংকটকে আরও ঘনীভূত করতে।

ঋদ্ধি বলে, ওইসব ব্যান্ডে কী করে বাংলা বলা হয় শুনিসনি? সামনে পেলে ছোঁড়া-ছুঁড়িগুলোকে থাপ্পড় মারতাম।

রুরু দার্শনিকের মতো বলে, কী করবি বল? কালের হাওয়া। হাওয়া হয়তো নিজেই ঘুরবে একদিন।

কিন্তু কবে? ঋদ্ধি বলে।

সপ্রতিভতার এমন অপব্যাখ্যা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে সম্ভবত আর কখনওই ঘটেনি। যত্তসব মাল্টিন্যাশানালস্ আর তাদের চাকর-ঝি চ্যাংড়া-চেংড়ি।

ক্ষান্ত হও বৎস, ক্ষান্ত হও। অমন যারা করে তারা একদিন মুছে যাবে। কখনও থাকবে না। রুরু বলল।

ঘণ্টা দুয়েক জোর বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখন আবার আকাশ একেবারে নির্মেঘ। এখন শুক্লপক্ষ। আজ পঞ্চমী কী ষষ্ঠী হবে। চাঁদ উঠেছে। বৃষ্টি ভেজা গাছগাছালির গায়ে ওই রুগ্‌ণ চাঁদের আলোই যেন রুপো বৃষ্টি করছে। মেয়েদের ঘর থেকে সুনয়নী আর গৈরিকা ডুয়েট গাইছে 'বৃষ্টি শেষের হাওয়া কিসের খোঁজে বইছে ধীরে ধীরে'। ভারি ভালো লাগছে শুনতে।

এখানে একটি ঘরে ওদের লাইব্রেরি করেছে ওরা। তাতে বটানির নানা বই যেমন আছে তেমন সাহিত্যের বইও আছে। তমালদা নিজে তো পড়েই, ঋদ্ধিরাও পড়ে সময় পেলেই। ইংরেজি ও বাংলা দুরকমের বইই আছে। তমালদা বলে, "লিটারেচার মেকস আ পার্শন।"

মাঝে মাঝে তমালদাও খোলা আকাশের নীচে চৌহদ্দিতে বসে নানা কথা শোনায় ওদের। কখন যে তমালদা এতকিছু পড়ল আর জানল তা ভেবেই অবাক হয় ওরা। যখন তমালদা বাইরে এসে বসে, বিশেষ করে রাতের বেলা, তখন ছেলেমেয়েরা প্রায় সকলেই এসে বসে।

শীতকালে বাইরে বসা যায় না, তখন ওরা লাইব্রেরি ঘরে বসে। একটি পেট্রোম্যাক্স আছে লাইব্রেরি ঘরে। তার আলোতে পড়াশোনাও করে তারা।

আজকেও তমালদা বাইরে এসে বসেছে। বিশাল কাকার জন্যে, যে একটি মাত্র কাঠের ইজিচেয়ার আছে তমালদার ঘরের লাগোয়া বারান্দাতে, সেটি এনে পেতে দিয়েছে বুধাই। বুধাই জোরের সঙ্গে বলে, রাতে এমন করে বাইরে বসা ঠিক নয়। অনেকরকম ভূত আছে এখানে।

পাখি, বিশাল কাকাকে জিজ্ঞেস করল, কাকাবাবু এখানে নাকি অনেকরকম ভূত আছে। আপনি তো খুঁটিতে অনেকদিন ছিলেন, মুন্ডাদের সম্পর্কে অনেক কিছুই তো জানেন আপনি। একটু বলুন না আমাদের।

কাকা বললেন, আমি তো এদেরই একজন হয়েছিলাম। মাথাটা কেচাইন করল বলেই তো এই স্বর্গ ছেড়ে চলে যেতে হল। আমি নিজেই তো এক ভূত।

—আপনার মাথা তো দিব্যি আছে দেখছি আমরা।

—আমার মাথার দিব্যি—আমিও তো তাই বলি। কিন্তু শালার পাগলে দেশ ছেয়ে গেছে। এখন পাগলদেরই রাজত্ব। সব সুস্থ মানুষগুলোকে ধরে ধরে পাগলা গারদে ভরে দিচ্ছে ওরা। পাগলদের মধ্যে ভালো পাগলও অনেক আছে। কিন্তু সব শালা খচ্চর পাগলগুলোকে ভোট দিয়ে ওরা পার্লামেন্টে পাঠাচ্ছে। আর সেই খচ্চরগুলো দেশ চালাচ্ছে।

তারপর বললেন এই তমালরা যে এম সি সি করে, বেশ করে।

—এই গুলি-গালা কি করা উচিত? এই সশস্ত্র বিপ্লবের কি শেষ আছে কোনো? এই পথে কি দেশের ভালো হবে? দেশে আইন-কানুন তো আছে। আইনের পথে চলাই কি ভালো নয়?

রেবতী বলল।

—আইন? বলিস কী রে তোরা? আইন কি আছে নাকি দেশে? এইসব আইন তো সব ভালো মানুষগুলোকে, গরিব মানুষগুলোকে জেলে ভরছে আর খচ্চরগুলো খচরামি করে বেড়াচ্ছে। আর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র সেই কবে বলে গেছিলেন, "আইন! সে তো তামাশামাত্র। বড়লোকেরাই পয়সা খরচ করিয়া সে তামাশা দেখিতে পারে।" বল দেখি, তখন তো তাও ইংরেজরা দেশ শাসন করত। প্রায় ষাট বছর হয়ে গেছে দেশ স্বাধীন হল, কত মানুষের বুকের রক্ত ঝরল, কত মূল্য দিতে হল সকলকে কিন্তু সাধারণ মানুষের, দেশের গরিব মানুষদের কী হল? বড়লোকগুলো আরও বড়লোক হল আর গরিবরা আরও গরিব। ইংরেজ আমলে আইন যতটুকু তামাশা ছিল আজ তার চেয়ে অনেক বড় তামাশা হয়েছে। কেঁদো কেঁদো উকিল ব্যারিস্টার কোর্টে গিয়ে শামলা পরে চেয়ারে একবার পোঁদ ঠেকালেই তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা পাচ্ছে আর গরিব বাদী-বিবাদীরা সর্বস্বান্ত হচ্ছে। যাদের পয়সা আছে তারাই তামাশা দেখছে আর অসহায় গরিবরা কেঁদে মরছে। এই স্বাধীনতা কি দিয়েছে সাধারণ মানুষকে? শুধুই ভড়ংবাজি আর দীর্ঘমেয়াদি প্রতিশ্রুতি।

ওরা সবাই চুপ করে ছিল। বিশাল কাকার কথার মধ্যে সত্য কতখানি আছে তা না জেনেও তাঁর কথার সার যে বেশ কিছু আছে তা তারা সকলেই বুঝতে পারছে। বোঝার মতো জ্ঞানগম্যি তাদের থাকুক আর নাই থাকুক।

তমালদা গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, ফিলিপিনস-এর টুপামারো বিপ্লবীরা একটা কথা বলে, জানিস? তোরা?

—কী কথা?—রুরু বলল।

'ইফ দ্য কান্ট্রি ডাজ নট বিলঙ টু এভরিওয়ান, ইট শ্যাল বিলঙ টু নো ওয়ান।' দেশের মালিক যদি প্রত্যেক দেশবাসীই না হয়, দেশ যদি

সকলেরই সমান ভোগ্যা নাই হয়, তাহলে সে দেশ কারওই ভোগ্যা নয়।

ওরা সকলে চুপ করে রইল।

তমালদা বলল, কাকা, আপনি যে এ অঞ্চলের মুণ্ডাদের নিয়ে একটি লেখা শুরু করেছিলেন তার কতদূর হল?

আর আমার লেখা!

তারপর বললেন, তোরা ছেলেবেলায় তৈলাক্ত বাঁশে বাঁদরের ওঠা নামার অঙ্ক করেছিলি?

—না তো।

রুরু বলল।

—অ। ভুলেই গেছিলাম তোরা তো সব ক্যালকুলেটর নিয়ে অঙ্ক পরীক্ষার দিনে অঙ্ক করেছিস, তোরা জানবি কী করে। শুভংকরীর আর্যার নাম শুনেছিস?

—না।

খুব বেঁচে গেছিস। সে কী গর্ভযন্ত্রণা রে বাবা! জীবনের সবচেয়ে ভালো সময়ের কতখানি যে আমরা ওইসব করে নষ্ট করেছি তা আমরাই জানি।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, তবে শিক্ষাব্যবস্থার হাল এখন যা হয়েছে, ওয়ান-ম্যান কমিশন, নো-ম্যান কমিশন করে করে তার চেয়ে বোধহয় আমাদের দিনই ভালো ছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে পণ্ডিতদের পণ্ডিতিতে দেশের, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার সর্বনাশ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলতেন না, যাঁরা সব পণ্ড করেন তাঁরাই পণ্ডিত। পবিত্র সরকারের মতো পণ্ডিতদের দেখে তাই মনে হয়। যাই হোক, আমার লেখা, সেই বাঁদরেরই মতো—এক গাঁট উঠছে তো দু গাঁট হড়হড়িয়ে নামছে। না যযৌ, না তস্থৌ হয়ে পড়ে রয়েছে। এখন বাঁদরকে কেউ

পেছন থেকে জোরসে লাথি না মারলে সে শালা উঠতে পারবে না এক গাঁটও।

—লাথি আমরা মারতে পারব না তবে আমাদেরই আজ্ঞা করুন না, আমরাই মারছি ঠেলা।

—আরে লেখা-ফেখা কি চাট্টিখানি কতা। মাল-ছড়ানো, পাতা-ভরানো খুবই সোজা। কিন্তু লেখার মতো লেখা অত সহজ নয়রে ছোঁড়ারা। পাঁচলাখি দশলাখি পুরস্কার দিলেই কি কেউ লেখক হয়ে যায় নাকি। লেখা বল, গান-বাজনা বল, ছবি আঁকা বল কিছুই রাজা-রাজড়ায় দয়া বা পৃষ্ঠপোষকতা নির্ভর নয়। আগেকার দিনের রাজা-রাজড়ারা হলেও না হয় কথা ছিল।

—আবার শুরু কর না কাকা। বিরসা মুণ্ডার এই এলাকার মুণ্ডাদের সঙ্গে এত বছর থাকলে, এত পড়াশোনা করলে, তোমার এই জ্ঞানের কিছু কি আমরা পেতে পারি না?

তমালদা বলল।

ওই জ্ঞান শব্দটাতেই তো আমার আপত্তি। ভগবান বিরসার উলগুলান বা মুণ্ডাদের সম্বন্ধে কিছুমাত্র না জেনে টিভি ক্যামেরা আর অশিক্ষিত কাগজওয়ালাদের বাহবা নিতে যেসব "**অ্যাক্টিভিস্টস**" নিজেদের সবজান্তা মনে করেন, নিজেদের শামিল করে পয়মাল করেন, ম্যাগাসাসাই ঘ্যাগাসাসাই পুরস্কার পান, তাঁরাই তো এখন সর্বমান্য। এখন ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভোলানোরই দিন। গভীরে কেউই যেতে চায় না। তাই ওইসব "চালাক" মানুষদের সঙ্গে প্রতিযোগিতাতে নামার আমার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছে নেই।

ঋদ্ধিরা চুপ করে রইল।

দূরের তাজনা নদীর উপরে টিটি পাখি টিটিরিটি—টিটরিটি—টিটিরিটি করে ডাকতে ডাকতে তাদের লম্বা লম্বা পা ঝুলিয়ে উড়ে

বেড়াচ্ছিল। একদল শেয়াল ডাকতে লাগল হুক্কা-হুয়া করে। একটু পরেই রাত নিশুতি হবে। এইসব মুহূর্তেই ঋদ্ধির মনে হয় গামহারডুংরীতে আসা সার্থক হয়েছে। নির্জন প্রকৃতির, পাহাড় জঙ্গল, নদী— ডুংরীর এই যে গহন রূপ, এই আদিগন্ত আকাশের ঔদার্য, ওকে যেন কোনো অন্য গ্রহে নিয়ে যায়।

আজকাল এখানে রাতের আকাশে অনেক স্যাটেলাইট দেখা যায়। তারারা বা গ্রহেরা অনেকে চলমান হলেও তা মানুষের দৃষ্টিগোচর নয় খালি চোখে। কিন্তু এই উপগ্রহদের চলা খালি চোখেই দেখা যায়। তারা পৃথিবী থেকে বেশি দূরে যাবে না বলেই তাদের পৃথিবী পরিক্রম করতে দেখা যায়। মোহাবিষ্ট হয়ে যায় ঋদ্ধি।

পাখি বলল, কাকা, আমাদের একটু ভূতের কথা বলুন।

বিশাল কাকা দূরে পাহাড়তলির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ওই যে তাজনা নদী দেখছিস...

রেবতী বলল, দিনের বেলাই এখান থেকে ভালো করে দেখা যায় না আর রাতের বেলা আপনি তাজনাকে কী করে দেখছেন?

কাকা হাসলেন। বললেন, নদীকে কি সবসময়ে চোখেই দেখতে হয়? নদীর গন্ধ ওড়ে। প্রতি নদীর গায়ে আলাদা আলাদা গন্ধ, নারীর গায়ের গন্ধের মতো। নদীকে দেখার দরকার কি? নদীকে feel করতে পারলেই হল। নদী যেখান দিয়ে বয়ে যায়, বাতাসে তার গন্ধ রেখে যায়। সেই গন্ধে তাদের চিনে নিতে হবে, জানতে হবে যে, নদী চলেছে দিনমানে, আঁধার রাতে, চাঁদের আলোয় ভাসতে ভাসতে। প্রত্যেক নদীও একলা পাগল। আমার বা তোরই মতো।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, রবীন্দ্রনাথের সেই গান আছে না?

—কোন গান?

—পাখি বলল।

—আরে সেই গানটারে। দুসস শালা! কিছুই মনে থাকে না আজকাল আমার।

তমালদার দিকে ফিরে বললেন, আরে তমু, ইসাবেলা কে রে? সাইকোর হাটে আমরা যখন পাথরের উপর বসেছিলাম তখন একটা ছোঁড়া এসে ইসাবেলা ইসাবেলা করছিল না? নামটা খুব চেনা চেনা লাগল কিন্তু চিনতে পারলাম না তো। ইসাবেলা কে রে? তোরা কি জানিস কেউ?

তমালদা এবং ওরা সকলে অস্পষ্ট ভূতুড়ে চাঁদের আলোতে চুপ করে বসে রইল নির্বাক হয়ে। ইসাবেলা নামটি চিনেও না চিনে।

—যাকগে মরুকগে। কে ইসাবেলা কে জানে। তা ওই তাজনা নদীর কথা বলছিলাম না?

কাকা বললেন।

আগে তো গানটার কথা বলবেন।

ও হ্যাঁ হ্যাঁ। মনে পড়েছে। ধরেছি শালিকে। কোতায় পালাবি র‍্যা। আজকাল আমার সব গণ্ডগোল হয়ে যায়। শুয়োর খাওয়ালি তোরা, শালা পেটের মধ্যে টুঁসোচ্ছে। এমনই গণ্ডগোল হয় যে মনে হয় সত্যিই বুঝি পাগল হয়ে যাব। পেয়েছি খুঁজে। গানগুলো সব সাপের মতো হিল হিল করে পালাতে চায়। খপ করে ন্যাজ চেপে ধরতে না পারলেই মুশকিল।

"পাগল যে তুই, কণ্ঠ ভরে
জানিয়ে দে তাই সাহস নাড়া
থাকিস কোণে দিসনে সাড়া—
বলুক সবাই 'সৃষ্টিছাড়া,' বলুক সবাই 'কী কাজ তোরে'।

'বল রে আমি কেহই না গো
কিছুই নহি, যে-হই না'।
শুনে বনে উঠবে হাসি,
দিকে দিকে বাজবে বাঁশি—
বলবে বাতাস 'ভালবাসি', বাঁধবে আকাশ অলখ ডোরে।।

ওরা সমস্বরে বলে উঠল, বাঃ।

গৈরিকা বলল, কাকা আপনি গান গাইতে পারেন?

পারতাম, পারতাম। অনেক কিছুই পারতাম রে যখন আমি পাগল ছিলাম। ভালো হয়ে গেছি তো এখন, সব ভুলে গেছি। এখন আর কিছুই পারি না। তোদেরই মতো আমিও তো একদিন তরুণ ছিলাম, আমারও তো যৌবন ছিল। যৌবন যখন থাকে তখন তার দাম বোঝা যায় না। আর যৌবনের লীলাখেলাও বোঝা যায় না, "জওয়ানি যত আতি হ্যায় বহতই সাঁতাতি হ্যায়, ঔর যব যাতি হ্যায়, তবতো ঔর ভি জাদা সাঁতাতি হ্যায়"। মকবুল মিঞা বলত। পাগলা গারদে আমার রুম মেট ছিল। ওর কেসও আইডেনটিকাল না হলেও প্রায় আমারই মতো ছিল। পাগল ও একেবারেই ছিল না। ওকে জোর করে ওর স্ত্রী আর স্ত্রীর প্রেমিক পয়সাওয়ালা বদরুদ্দিন মিঞা পাগল বলে গারদে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তারপর আর কী!—পয়সা ছিল না, মুরুব্বি ছিল না, পাগলদের সঙ্গে থাকতে থাকতে সে সুরতহারামও সত্যি সত্যিই পাগল হয়ে গেল।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, অবশ্য ছাড়া পেয়ে ও-ও আমারি মতো ভালো হয়ে গেছে। বাড়ি ফিরে দেখে, ডুরাণ্ডার ভাঙা বাড়িটা খাণ্ডাহার হয়ে গেলেও, আছে, কিন্তু ইমারতের প্রাণ নেই। বউ-বাচ্চা সব নিয়ে সেই শালা নিমকহারাম দোস্ত নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। সেই শূন্য বাড়িতে হাহাকার করতে করতেই মকবুল মরে

গেল। ভালো হয়েই মরে গেল। মুন্না মুন্না করে তার ছোট মেয়েটার নাম জপ করতে করতে চলে গেল।

একটু গুম মেরে থেকে বিশাল কাকা বললেন, নারীরা নদীরই মতো অনেকটা। কিন্তু তাদের মন নদীর মতো বড় এবং উদার ঠিক নয়। শালিরা বহতই হারামজাদি হয়। ঢাল পেলেই গড়িয়ে যায়, মকবুলের বিবি যেমন গেল, আমার বউদি যেমন গেল।

পাখি, গৈরিকা আর সুনয়নী মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

তমালদা ক্ষমা চাওয়া চোখে চাইল ওদের মুখে। যদিও সেই অস্পষ্ট দুধলি আলোতে কারও মুখই দেখা যাচ্ছিল না।

ছেলেদেরই মতো, মেয়েরাও সবাই চান করেছিল বৃষ্টিতে ভেজার পরে ডুংরিতে ফিরে তবে ছেলেদের চান আর মেয়েদের চানে তফাত আছে, চিরদিনই ছিল। কে কী সাবান আর পাউডার মেখেছে কে জানে। ওদের গা থেকে গন্ধ উড়ে সমস্ত জায়গাটাকে সুরভিত করে রেখেছে।

তমাল ভাবছিল, পাখির দিকে চেয়ে, বিশাল কাকা যাইই বলুন, নারীরা মোটেই হারামজাদি নয়—তারা নদীরই মতো—তারা নইলে পুরুষদের অস্তিত্ব পুরোপুরিই ব্যর্থ হত। পুরুষদের সব পূর্ণতা নারীদেরই মধ্যে।

মাঝে মাঝেই ঋদ্ধির ভারি ভয় করে। তমালদার ডাক শুনে বিরসা মুণ্ডার এই দেশে এসে তার সর্বনাশ হতে পারে যে-কোনোদিন। অথবা সেও কারও সর্বনাশ করতে পারে। প্রকৃতি এক ডাইনি। যারাই প্রকৃতির মধ্যে এমনভাবে বাস করেছেন কখনও, যুবতী নারীদের সান্নিধ্যে, শুধু তাঁরাই এই কথার সত্য জানেন। তারের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছে ঋদ্ধি প্রতিদিন, প্রতিরাত। হয়তো অন্যরাও তাই হাঁটছে। যে কোনো সময়েই পতন ঘটতে পারে। ঘটলে সেই পতনের

রকম যে কী হবে, সে সম্বন্ধে ওদের কারোরই কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই।

বিশাল কাকা বললেন, নিস্তব্ধতা ভেঙে, ওই যে তাজনা নদী, একসময়ে সে তার পাথর আর বালির জন্য খুবই বিখ্যাত ছিল। বছরের পর বছর ঠিকাদারেরা নদীর বুক খুঁড়ে বালি নিয়ে গেছে ট্রাকে ভরাট করে শহরাঞ্চলের মানুষের পাকা বাড়ি বানাবার জন্য। গরমের দিনে নদীর বুকময় ছড়ানো অজস্র পাথরগুলোকে ডিনামাইট দিয়ে ভেঙে টুকরো করে ট্রাকে করে নিয়ে গেছে। তবে নদী প্রতি বর্ষাতেই প্রকৃতির অনন্ত ভাণ্ডার থেকে বালি বয়ে এনে আবার নদীখাতকে ভরে দিয়েছে। এনেছে নতুন পাথরও। নদী হয়তো নিরুচ্চারে গান গেয়েছে, "আমারে তুমি অশেষ করেছ এমনই লীলা তব, ফুরায়ে দিয়ে আবার ভরেছ জীবন নব নব।'

রুরু বলল, এটা কি কোনো ব্যান্ডের গান কাকা?

কাকা বললেন, এটা চিরন্তন ব্যান্ডের গান। দাড়িওয়ালার গান।

আবারও গ্রীষ্মে মানুষ এসেছে, ট্রাক ও টেম্পো নিয়ে।

মানুষের এই লোভও সর্বগ্রাসী। তোরা সবাই দেখে নিস মুণ্ডাদের ওই "খুম্বুরু-জুম্বুরি'ই অবশেষে কাল হবে আমাদের। প্রকৃতিকে এই ভাবে ধর্ষণ করার শাস্তি তাকে পেতেই হবে। সব গাছ কেটে ফেলা, নদীর বুক থেকে পাথর তুলে নিয়ে তাকে রিক্ত করা, এই সবেরই শোধ প্রকৃতি নেবেই একদিন।

রুরু বলল, সেটা ঠিক। ইকোলজির এমন সর্বনাশ তো আগে হয়নি কখনও। হিমবাহ গলে যাচ্ছে, অমরনাথের শিবলিঙ্গ গলে যাচ্ছে, চারদিকে বন্যা, ভূমিকম্প। আমার পিসি কানাডার মনট্রিয়াল থেকে কলকাতাতে লিখেছেন যে এবছরে সেখানে নাকি চল্লিশ ডিগ্রি গরম। অভাবনীয়। এসবই আমাদেরই কৃতকর্মের ফল।

'খুম্বরু-জুম্বুরি'টা কী ব্যাপার কাকা?

তমালদাই জিজ্ঞেস করল এবারে।

'খুম্বুরু-জুম্বুরি' হচ্ছে মানুষের প্রধানতম রিপু। এতবড় পাপ আর নেই। মুণ্ডারি ভাষাতে লোভকেই বলে 'খুম্বুরু-জুম্বুরি'।

পাখি বলল, আমরা আরও একটা শব্দ শিখেছি মুনরীর কাছ থেকে।

—'রিঙ্গিচিঙ্গি-চিকনপিণ্ডা'।

হেসে উঠলেন কাকা।

বললেন, বাঃ। মাদার টেরিজা সবসময়ে বলতেন না, 'ক্লিনিলিনেস ইজ গডলিনেস'। এটা মস্ত বড় গুণ মুণ্ডাদের। তোরাও সকলেই রিঙ্গিচিঙ্গি চিকনপিণ্ডাতে বিশ্বাস করবি সবসময়ে।

পাখি বলল, আমার ভূতের গল্পটাই হল না। বলুন কাকা।

হ্যাঁ। বলি।

ইতিমধ্যে রেবতী বলল, 'ইকোলজি' শব্দটি আজকাল প্রায়ই সকলের মুখেই শুনতে পাওয়া যায়, ইকোলজি, ইকো-ট্যুরিজম। আসলে এই শব্দ দুটির মানে কি? জানেন নাকি কাকা? এই তো একটু আগে রুরু ব্যবহার করল শব্দটা।

কাকা বললেন, হাসতে হাসতে, বলছি।

ঋদ্ধি ভাবছিল, কাকাকে ওদের লাইব্রেরি ঘরের আলমারির মধ্যে ভরে রেখে দেবে। উনি তো অখণ্ড এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা।

কাকা বললেন, 'ইকো ট্যুরিজম' দুটি ইংরেজি শব্দর গাঁটছড়া। বিজ্ঞানী আর্নস্ট হ্যাকেল ১৮৬৯ সালে ইকোলজি শব্দটির উল্লেখ সর্ব প্রথমে করেন। এই শব্দটি দুটি গ্রিক শব্দ গাঁটছড়া বাঁধাতে হয়েছে। OIKOS মানে বাড়ি বা বাস্তু আর OLOGY মানে স্টাডি বা অধ্যয়ন। বিজ্ঞানী HACKEL এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন এই অর্থে

"The investigation of the total relations of the animal in its organic and inorganic environment."

তারপর কাকা বললেন, শুনেছি, কোন অভিধানে পণ্ডিত পবিত্র সরকার এই শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ করেছেন 'বাস্তুসংস্থান', 'যৌথ বসবাসনীতি' ইত্যাদি। তা আমি বোকা পাঁঠার কারবারির ছোট ভাই আমি আর কতটুকু জানব? ওলচিকি ভাষার ডক্টরেট অবশ্যই আমার চেয়ে বেশি জানবেন।

এবারে আমার ভূত। পাখি বলল।

তোমার ভূত নয়, মুণ্ডারিদের ভূত। তবে এই অবিরত প্রকৃতি নিধনে মানুষ যেমন প্রতিনিয়তই উদ্বাস্তু হয়ে যাচ্ছে, ভূতেরাও যাচ্ছে। খুঁটি থেকে যে কাঁচা পথটা সাইকো, তামার, হয়ে টাটা এবং রাঁচী থেকে আসা হাইওয়ের উপরে সুবর্ণরেখার পাশের বুণ্ডুতে পৌঁছে গেছে, সে পথে একসময়ে এমন নিশ্ছিদ্র জঙ্গল ছিল যে মুণ্ডারা দল বেঁধে হাতে টাঙ্গি, তির-ধনুক, বল্লম নিয়ে সে পথে চলাচল করত। পরে সে পথ ঝাড়খণ্ডী আন্দোলনের ছেলেদের কব্জাতে ছিল। কারও উপায় ছিল না সে পথে চলাচল করে। মুণ্ডুর ওপারে বলরামপুরেও খুব জঙ্গল ছিল—সেখান থেকে ঝালদা। জঙ্গলে জানোয়ার যেমন ছিল, ডাকাতও ছিল তেমন। হয়ত এখনও আছে। সেই রকমই জঙ্গল ছিল টেবো ঘাটে—চক্রধরপুর পর্যন্ত। বন্দগাঁও—বাঁদিকে ওড়িশার গয়েলকেরা সব জঙ্গলই জঙ্গল ছিল সব। ভূতেরা মনের সুখে থাকত।

—পাখি বলল, ভূত। আমার ভূতের কী হল?

—হ্যাঁ এবারে সত্যিই বলছি। এখানে মুয়া ভূত আছে। মুয়া ভূত চান্ডি-চুরিণ এর মতো ভূত। চান্ডি হচ্ছে পুরুষ ভূত আর চুরিণ মেয়ে ভূত। ওরা গাছে থাকে বা পাথরে। গাছ ও পাথরের অস্তিত্বও প্রায়

লোপ পেতে বসেছে তাই এখন চান্ডি-চুরিণ ভূত কোথায় যে থাকে তা বলা মুশকিল। এরা রাতের বেলা বেরোয়। এমনিতে দেখতে মানুষেরই মতো কিন্তু কখনও কখনও কুকুরের, বলদের, হাতির, শুয়োরের বা বাঘ ইত্যাদির রূপ ধরে।

এই কারণেই এরা রাতকে এত ভয় করে। এদের রূপকথাতে রাত আর দিনেরও খুব ইন্টারেস্টিং গল্প আছে। পরে শোনাব একদিন। সব গল্পই তোদের একদিনে বলে দিলে এই অকর্মার ঢেঁকিকে তো তোরা তাড়িয়েই দিবি, খেতে দিবি না।

ওরা সকলে হইহই করে উঠল। বলল, তা নয় অন্যদিন বলবেন কিন্তু তমালদা যখন আপনাকে এনে দিয়েছে আমাদের কাছে আপনাকে আর ছাড়া হচ্ছে না।

পাখি বলল, আমার ভূত।

খুঁটকাট্টি ভূত হচ্ছে সবচেয়ে বড় ভূত। 'ইকির-বোঙ্গা', 'বুড়ুবোঙ্গা', আর 'মুয়া' ভুত তো ছিলই। এদের দুটি চোখ আগুনের মতো জ্বলে, বিশেষ করে চুরিণের। হাতে-পায়ে বড় বড় নখ। লম্বা লম্বা চুল। জঙ্গলের মধ্যে গ্রামের কোনো গোরু-বয়েল-বকরি হারিয়ে গেলে মুয়া ভূত তাদের লুকিয়ে ফেলে। একরকম জলের ভূতও আছে। তারা জলে থাকে। নদীতে, তালাওতে। তাদের নাম 'নাগে-বোঙা'। তাদেরও পুজো দেয় ওরা নিয়মিত। ভূতের প্রতিকারের জন্যে তারা ভগতদের কাছে যেত। তারা যা বিধান দিত তাই করতে হত।

—কী বিধান দিত তারা?

এই মুয়াকে খৈনি বা বকরি বা মুরগি এসব নিবেদন করে প্রার্থনা করত মুয়া যেন তাদের গৃহপালিত পশুকে ছেড়ে দেয়। এই রকম আর কী।

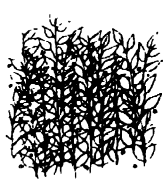
বলেই বললেন, চল তমু, এবারে শুয়ে পড়া যাক। হিম পড়ছে। বর্ষাতেও হিম পড়ে।

তাছাড়া, পাখির দিকে চেয়ে বললেন, রাত গভীর হল, তেনারাও তো আছেন। না, কি?

দুটো পেঁচা নতুন টাঁড়ের দিক থেকে ঝগড়া করতে করতে ডুংরির বড় বড় গামহার গাছগুলোর দিকে উড়ে গেল। সেখানে ঝুড়ি ঝুড়ি অন্ধকার। গামহারডুংরীর বহু পুরানো সব গামহারেরা সব নানা কারণে কুখ্যাত। নানা গল্প আছে ওই গাছগাছালি নিয়ে। ওরা সবাই জানে বুধাই, মুনরী, ঝিরি বা ঝাঝা কেউই রাতের বেলা ওদিকে যায় না। একশো টাকার নোটের লোভ দেখালেও যাবে না। সেদিকে চেয়ে পাখির গাটা ছমছম করে উঠল।

ওরা সকলেই উঠে যে যার ঘরে গেল। রাত কত হল কে জানে! তাজনা নদীর উপরে টিটি পাখিরা সমানে ডেকে যাচ্ছিল ডিড-উ্য-ড্যু-ইট? ডিড-উ্য-ড্যু-ইট ডিড-উ্য-ড্যু-ইট? শেয়ালেরাও আরেকবার হুক্কা হুয়া করে ডাকল। ওরা প্রহরে প্রহরে ডাকে। মাঝে ফিঁচ ফিঁচ করে একবার ফেউ-এর ডাকও শোনা গেল।

যার যার বিছানাতে গিয়ে শুয়ে পড়ল ওরা মাথার মধ্যে নানা মিশ্র ভাবনা নিয়ে, পায়ের কাছে রাখা চাদরগুলো কোমর অবধি টেনে নিয়ে। শেষ রাতে শীত শীত লাগে। রাতে আবারও হয়তো বৃষ্টি নামবে।



●

ফিস ফিস করে বৃষ্টি পড়ছিল সকাল থেকেই। শেষ সকালে হলুদ রোদ বেরিয়েছে মেঘ ছিঁড়ে। তাজনা নদী, গামহারডুংরী পাহাড়, পাহাড়ের উপরে তাদের সৃজন-করা বন আর পাহাড়তলির স্বাভাবিক বন, যা ওদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতে নবজীবন পেয়েছে, সবই গায়ে-হলুদের সকালের কনের মতো সেজেছে হলুদ মেঘে।

অনেকই দিন থেকে মেয়েরা মুনরীকে ধরেছিল ওদের গাঁয়ে যাবার জন্যে। ওদের গাঁয়ের জীবন, ওদের পাড়া, সখা-সখি, ওদের বিশ্বাস-অবিশ্বাস, রীতি-নীতি সম্বন্ধে জানতে। পাখি, সুনয়নী ওরা সকলেই তমালের কাছ থেকে একদিনের ছুটি নিয়েছিল। তমাল বলেছিল, ভালোই তো। যে অঞ্চলে তোমরা রয়েছ সে অঞ্চলের সবকিছু জানাটা তো শিক্ষার মধ্যেই পড়ে। তবে ফিরতে বেশি রাত কর না। যদিও এখানে বড় শহরের শিক্ষিত মানুষেরা থাকেন না তাই তোমাদের কোনো ভয় নেই. তবু মুনরীকে বল যে তোমাদের সঙ্গে বেশ হাট্টাকাট্টা ছেলে এক বা একাধিক যেন আসে লাঠি নিয়ে রাতে তোমাদের গামহারডুংরীতে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে। আর কিছু না হোক, সাপ-খোপের ভয় তো আছেই। এই গারো অঞ্চলেই সাপের বড়ই উপদ্রব। তার উপরে এখন বর্ষাকাল।

মুনরীদের গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছে মুনরী বলল, তোমাদের সঙ্গে কয়েকজনের আলাপ করিয়ে দেব। তাদের সঙ্গে কথা বললে, সময় কাটালেই তোমরা এ অঞ্চলের মানুষজন, আমাদের রীতি-নীতি, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, চাওয়া-পাওয়া সব সম্বন্ধেই জানতে পারবে।

সিরকা মুণ্ডা হচ্ছে এই গাঁয়ের গাঁও-বড়া। আর চাটান মুণ্ডা হচ্ছে যৌবনের দূত। চাটানের কথা, সিরকা মুণ্ডার কথা, চাটান এর সাকামচারি দেওয়া বউ উসকির কথা আর এখনকার প্রেমিকা মুঙ্গরীর কথা জানলে আমাদের কবরখানা সাসানডিরি সম্বন্ধে জানলে, অনেক কিছু জানতে পাবে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, বেশ কয়েকবছর আগে লামা কোয়েনিতে কাজ করতে এসেছিল। বুকুবাবু কলকাতা থেকে। কোম্পানির হিসাব রাখত। সেই বাবু মুঙ্গরীর প্রেমে পড়েছিল কিন্তু বাবুটা বড় মুখচোরা ছিল, মুখ ফুটে কোনোদিনও মুঙ্গরীকে বলতে পারেনি তার ভালোবাসার কথা। অপরূপ সুন্দরী মুঙ্গরী কিন্তু তার আগেই প্রেমে পড়েছিল চাটানের—যার বউ উসকি ছিল তার পিসি। প্রেম যখন হয় তখন সব বাধাই উড়ে যায়। চাটান আর মুঙ্গরী সোনা আবিষ্কার করেছিল। সেই সোনা পাহারা দিত গভীর উপত্যকার জঙ্গলের মধ্যে এক সোনালি সাপ। সেই সোনা উদ্ধার করতে গিয়েই দাবানলে ওরা দুজনেই পুড়ে মারা যায়।

তোমাদেরই এক বাঙালি লেখক আচ্ছুরাম কালকাকমএ কাজে এসে ওদের নিয়ে একটি বই লেখে যার নাম 'সাসানডিরি'। সাসানডিরি মানে হল কবরভূমি। যদিও আমি বাংলা পড়তে পারি না, কারখানার বুকুবাবু আমাকে সেই বইয়ের একটি কপি দিয়েছিলেন। আমার বাড়িতে ঝাঁপির মধ্যে সে বই যত্ন করে রাখা আছে। চলো, আজকেই তোমাদের সে বইটা দেব। তার কিছুটা যদি পড় গামহারডুংরীতে ফিরে তাহলেই অনেক কিছু জানতে পারবে।

ওরা সমস্বরে বলল, বাঃ তাহলে তো বেশ হয়। তাই দিও।

সবই ভালো ছিল কিন্তু বাদ সাধল প্রকৃতি। কোথা থেকে দমকা হাওয়ার সঙ্গে মেঘের পাহাড় এসে ভেঙে পড়ল ওদের মাথায়। ওরা দৌড়োতে দৌড়োতে মুনরীদের বাড়িতে পৌঁছাল সকলে। মুনরীর

বউদি ওদের গামছা দিল গা-মাথা মুছতে। কিন্তু ওরা বড় গরিব। সকলকে পরতে দেবার মতো শাড়ি ছিল না ঘরে। মুড়ি আর কাঁঠালের বীচি ভাজা খেয়ে বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণ না দেখতে পেয়ে ওরা মনমরা হয়ে গামহারডুংরীর দিকে ফিরে চলল। মুনরীর দাদা এবং আরও একজন টাঙি কাঁধে ফেলে ওদের পৌঁছে দিতে চলল। বাড়ি থেকে বেরোবার আগে এক দৌড়ে মুনরী গিয়ে সেই 'সাসানডিরি' বইটা পলিথিনের একটি ঠোঙার মধ্যে ভরে পাখিকে দিল।

মুনরী বলল, তোমাদের আসা বিফল হল বটে কিন্তু এই বইটা পুরো পড়লে এ অঞ্চল সম্বন্ধে তোমাদের অজানা কিছুই আর থাকবে না। যারা বাংলা জানে তাদের মধ্যে অনেকেই এই বই পড়ে সে কথা বলেছে আমাকে।

বেশ। দেখি দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে কি না। ওরা ফিরে চলল। বৃষ্টির তোড় কমল বেশ কিছুক্ষণ পর। এখন হালকা বৃষ্টি হচ্ছে। তারপর ওরা তাজনা নদীর কাছে যখন পৌঁছেছে তখন বৃষ্টি ধরে গেল! নদীর উপরে জোনাকি জ্বলতে লাগল। আর সেই পাখিগুলো যারা ডিড-উ্য-ড্যু-ইট করে ডাকে, ডাকতে লাগল চমকে চমকে।

আজকে আমাদের হেঁসেলে কী রান্না হয়েছে মুনরী?

আমি জানি না। ওরাই জানে।

রান্না যাই হোক। তোমার দাদা এবং দাদার বন্ধুকে গরম গরম খাইয়ে দিতে হবে কিন্তু নইলে তমালদা খুব রাগ করবেন।

না, না আমরা খাব না। ফিরতে রাত হয়ে যাবে।

তা কি হয় নাকি?

মাঝে মাঝে টর্চ জ্বালিয়ে ওরা গামহারডুংরীতে চড়তে লাগল। সপসপে বৃষ্টিভেজা বন-পাহাড়ে টর্চ-এর আলো বিদ্যুৎ চমকের মতো ঝিলিক মারতে লাগল।

●

বইটা নিয়ে এসেছে প্রায় সাতদিন হয়ে গেল। ঋদ্ধি বলেছিল আমি পড়ব তোমরা সবাই শুনবে।

ঋদ্ধির কণ্ঠস্বরটি খুব ভালো। একসময় নাটক-টাটকও করত। তমাল বলেছিল, আমাকেও ডেক তোমরা। 'সাসানডিরি' বইটার কথা আমিও শুনেছি অনেকের মুখে কিন্তু পড়ার সুযোগ হয়নি।

পুরো বইটা তো একদিনে পড়া যাবে না।

তমাল বলেছিল, মাঝখান থেকে পড়া শুরু করলে বোঝা যাবে বইয়ের টেনে ধরে রাখার ক্ষমতা আছে কি না। সকলের ভালো না লাগলে পড়া থামিয়ে দিলেই হবে।

শেষে এক শনিবার ওরা বসল খাওয়া-দাওয়ার পরে বইটি নিয়ে।

খাওয়া-দাওয়ার পরে হ্যাজাকটাকে বাইরে এনে টুল-এর উপরে রেখে ওরা হ্যাজাকের চারধারে বসল গোল হয়ে। ঋদ্ধি এক চাঁটি মেরে বইয়ের মাঝখানটা খুলে পড়তে শুরু করল।

"তাজনা নদীতে চান করে উঠে হাঁটতে হাঁটতে চাটান মুণ্ডা একবার ভাবল সির্‌কা মুণ্ডার কাছেই চলে যায়। লুট্‌কুম্‌-এর কাছে। দু-গালের হাড় বের-হওয়া বুড়োর কাছে। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে ভালো লাগে চাটান্‌-এর যে, এখন বুড়োর কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই কোনো

বিশেষ মানুষ বা প্রজন্মের প্রতিই। বুড়োর মধ্যে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সবই লীন হয়ে গেছে। বুড়োর সঙ্গে সমানে সমানে কথা বলা চলে। বুড়োর কোনো নোংরামি নেই, নীচতা নেই; মৃত্যুর খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে বলে বুড়োর শরীর মনের সব খাদ যেন ঝরে গেছে।

খিদেতে পেট জ্বালা করছে। কোথায় যায় চাটান্? বাড়ি গেলেই তো উস্‌কির রোজগারের খাবার খেতে হবে তার তেতো তেতো কথার সঙ্গে ভাতই হোক, কী হাঁড়িয়াই হোক; কী কাঁটাল সেদ্ধই হোক। বড়ই লজ্জা করে চাটান্-এর।

উস্‌কি প্রায়ই বলত চাটান্‌কে যে, সে নিমরদ। বিয়ের পরে পরে বছর দু-তিন তাদের সম্পর্ক স্বাভাবিক ছিল। তবে ছেলেমেয়ে যে হয়নি এটা সত্যি। চাটান-এর সেজন্যে উসকির বিরুদ্ধে কোনোই অভিযোগ ছিল না। উসকিকে নিয়েই সে সুখী ছিল। কিন্তু উসকি সবসময়ই এ ব্যাপারে সোচ্চার ছিল। শুধু তাইই নয়, বাইরের মানুষকেও ও বলে বেড়াত যে চাটান্ নিমরদ। এবং উসকির এই অনুযোগের মধ্যে একধরনের পুরুষ-মানুষেরা অপ্রত্যক্ষ এক আমন্ত্রণও দেখতে পেত। সেই আমন্ত্রণের ফল কী হত তা চাটান্ জানে না, তবে উসকি ওইরকম ভাবে চাটানকে অপদস্থ করাতে সে খুবই দুঃখ পেত। রাগ যদিও করেনি কোনোদিনই। মেয়েদের উপরে রাগ করার স্বভাব চাটান-এর নয়।

ওর অবাক লাগত এই ভেবে যে, বেশির ভাগ মেয়েরাই তাকে পছন্দ করত এবং তার কাছেও প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ আমন্ত্রণ কম ছিল না। কিন্তু উদাসী চাটান-এর ভালো-লাগা না-লাগাটা একটু অন্যরকম। কাউকেই ওর তেমন ভালো লাগে না। মুঙ্গরী! মুঙ্গরী শুধু ব্যতিক্রম! তবে কাউকে ভালো লাগলেও, বেশিদিন ভালো লাগে না।

গত দু-তিন বছর হল উসকির সঙ্গে ওর কোনো শারীরিক সম্পর্কই নেই। শারীরিক সম্পর্কেও আসল হল মন। মন যদি সরে যায়, তাহলে শরীরও চায় না শরীরকে। মন সরে গেছিল চাটান-এর উসকির কাছ থেকে।

মুণ্ডাদের পঞ্চায়েত যখন 'সাকামচারি'র বিবেচনা করে তখন তারা দুটি কথাতেই বুঝে যায় যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সেই দম্পতির মধ্যে আছে না নেই! "নেই" বুঝলেই 'সাকামচারি' দিয়ে দেয় পঞ্চায়েত। শালগাছের পাতা ছিঁড়ে ফেলেই সম্পর্ক শেষ করে দেওয়া হয়।

চাটান 'সাকামচারি' চায়নি, উসকিও চায়নি। দুজনেই হয়তো ভেবেছে কোনো অনুযোগ নিয়ে যাবে পঞ্চায়েতের কাছে? মারামারি নেই, ঝগড়া নেই, শুধু শৈত্য আছে। উষ্ণতার কথা বাইরের লোককে সহজে বলা যায়, বৈষম্য বা অসম্প্রীতি উঁচু গ্রামে বাজলে বলা যায় সে-কথাও। কিন্তু মাঘ মাসের শীতেও যে দম্পতি একে অন্যের কাছ থেকে এড়িয়ে যায় তাদের শৈত্যের কথা বাইরের লোক জানবে কী করে?

পঞ্চায়েতে গিয়ে হয়তো স্বামী অনুযোগ করল যে, স্ত্রী তাকে খেতে দেয় না। স্ত্রী প্রতিবাদ করে বলল, "কী অন্যায়। না চাইলে, জানব কী করে যে সে খেতে চায়?" এই প্রশ্নোত্তরেই পঞ্চায়েতের বুড়োরা বুঝে নেয় যে ব্যাপারটা কী!

তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, বোঝা যাচ্ছে যে, "মিয়াদ্ পাটিরে কাকিং গিটিটানা।" মানে, "এরা দুজনে এক মাদুরে শোয় না।" পঞ্চায়েত 'সাকামচারি' দিয়ে দেয় তক্ষুনি দুজনকে।

মুঙ্গরীর সঙ্গে চাটান-এর সম্পর্কটা একদিন জানাজানি হবেই। আর হলে তো পঞ্চায়েত ওদের ক্ষমা করবে না। উসকিও জানলে কি

করবে বলা যায় না। মৃত্যুর পরেও ওদের ছায়া কেউ আর বাড়িতে আনবে না।

নইলে, ওরা মরে গেলে, ওদের ছায়া বা 'উম্বুল্'কে এনে বাড়িতে 'ওরা-বোঙা' করে রাখত সকলে। সযত্নে। 'ওরা-বোঙা' ধনদা। মৃতকে যেদিন কবর দেওয়া হয় সেই দিনই সাসান্‌ডিরিতে সন্ধের অন্ধকার নেমে এলে একটি দল মৃতের ছায়া বা "উম্বুল" আনবার জন্যে বেরিয়ে পড়ে। ওরা বেরোলে তিনজনের একটি ছোট দল মৃতের অন্ধকার বাড়িতে একটি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বসে থাকে। যখন সাসানডিরি থেকে ছায়া নিয়ে ফেরে অন্যেরা তখন ডাকাডাকি করলেও প্রথমে দরজা খোলে না তারা। যেন, বাইরে চোর-ডাকাত বা বাজে লোক এসেছে। তারপরে দু-দলের মধ্যে প্রশ্নোত্তর চলে কিছুক্ষণ। তার শেষের দিকটা এইরকম।

ভিতরের মানুষেরা, যারা ছায়া আনতে গেছিল; তাদের শুধোয়,

—তোমরা কি এনেছ? সুখ না দুঃখ?

—দুঃখকে অনেক দূরে ফেলে এসেছি আমরা। সুখ, শুধু সুখই নিয়ে এসেছি।

—কী চাও তোমরা এখানে?

—একটু থাকার জায়গা চাই। বড় ক্লান্ত আমরা।

—তোমরা হয়তো কোনো রোগ নিয়ে এসেছ। কি?

—সব রোগকে আমরা বানের জলে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি, শুধু সুখ নিয়ে এসেছি; সুখ।

—আর কী এনেছ তোমরা?

—আমরা গোরু-ছাগল এনেছি, ধান আর চাল, আরও অনেক ভালো ভালো জিনিস!

ঠিক আছে, দরজা খুলছি, এস ভিতরে; তোমাদের বিশ্রামের জায়গা দেব।

তখন ভিতরের লোকেরা দরজা খুলে দিয়ে বাতি জ্বালিয়ে দেয় ঘরের মধ্যে। বাইরে যারা দাঁড়িয়েছিল, তারা ঢোকে। তাদেরই মধ্যে একজন বলে, ডুক্! ডুক্! যেন গোরু তাড়িয়ে ঘরে ঢোকাচ্ছে।

"ওরা-বোঙা" হয়ে, মানে-সম্মানে, আদরে-আপ্যায়নে থাকা হবে না আর চাটান্ এবং মুঙ্গরীর। কী যে হবে!

মাঝে মাঝে নিজেকে বোঝায়, দূর দূর। আজকাল ওসব নিয়মকানুন, সংস্কার, ধর্ম কেউ মানে নাকি?

যখনই এমন ভাবে চাটান, তখনই দীর্ঘ, ঋজু শরীরের বৃদ্ধ সিরকা মুণ্ডার কাটা-কাটা চোখ-নাক-চিবুকের মুখটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে, প্রখর সততা, ধর্মবোধ এবং ব্যক্তিত্বের প্রতীকেরই মতো।

ভয় করে চাটান-এর।

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে চাটান দেখল দূর থেকে, লণ্ঠন জ্বলছে উসকির "রিঙ্গি-চিঙ্গি চিকনপিণ্ডা" বাড়িতে।

উসকির বাড়ি যে রিঙ্গি-চিঙ্গি চিকনপিণ্ডা সে বিষয়ে কেউই দ্বিমত করবে না। কিন্তু কারও বাড়িই কি বাড়ি হয়ে ওঠে যদি সে বাড়িতে ভালোবাসা না থাকে? যতই রিঙ্গি-চিঙ্গি চিকনপিণ্ডা হোক না কেন সে বাড়ি! প্রায় বাড়ির কাছেই পৌঁছে গেছে এমন সময় দেখে গাঞ্জু তারই বাড়ি থেকে বেরোল, রান্নাঘর থেকে দুধ খেয়ে হুলো-বেড়াল যেমন করে বেরোয়, তেমন করে। সাবধানে। ইতি-উতি চেয়ে। চাটান একবার ভাবল, দেয় গাঞ্জুকে ধরে ভালো করে পেটান। তারপরই ভাবল দুস্‌স। কী লাভ?

চাটান জানে উসকি গাঞ্জুকে পাত্তা দেয় না। পরনির্ভর স্বর্ণলতার মতো কিছু ইতর পুরুষ থাকে-না সংসারে, যারা মেয়েদের করুণা

শিকার করে বেঁচে থাকে, মেনিমুখোরা; গাঞ্জুটা সেই জাতের পুরুষ। কোনো মেয়েরই সম্মান পাবে না ওরা।

উসকি দাওয়ায় বসে হুঁকো খাচ্ছিল।

চাটান-এর পায়ের শব্দ পেয়ে মুখ তুলে তাকাল শুধু। কথা বলল না। উসকির ব্যবহারে অন্যায়কারীর ভাব নেই। চোরের ভাব নেই। বরং ঔদ্ধত্য জ্বলছে ওর চোখে।

কিছু খাবার আছে?

চাটান বলল।

তৈরি খাবার নেই। সারাদিন কাজ করে এলাম। নিষ্কর্মা স্বামীর তো উচিত বউকে অন্তত রেঁধে খাওয়ানো।

হয়তো উচিত।

হয়তো নয়, অবশ্যই উচিত।

আমিও তো কাজ করেই এলাম। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি।

ফুঃ। কী কাজ?

গাছের বীজ পুঁতে এলাম তাজনার দু'পাশে।

টাকা পেয়েছ কিছু?

যে-কাজে 'টাকা নেই', তা বুঝি কাজ নয়?

না। কাজ নয়।

খেতে দেবে না, দিও না। কিন্তু যা জানো না, তা নিয়ে কথা বোলো না।

কী জানি না? যে টাকা-রোজগার করে, যে সংসারের ভরণ-পোষণ করে, সেই তো সব জানে। তোমার মতো মানুষের জানাজানির দাম কী?

আমি যাচ্ছি।

তুমি এসেছিলে কেন?

এটা আমার, আমাদের বাড়ি বলে।

বাড়ি! আমাদের! ফুঃ? তোমার সঙ্গে আমার কোনো কি সম্পর্ক আছে?

জানি নেই। তবে থাকত যদি ...। আমি গাছ লাগাই উসকি, গাছ বাঁচাই আমি; গাছ আর আমি, গাছ আর আমরা এক। একইরকম। তুমি বুঝবে না। যারা গাছ ভালোবাসে তারা বড় নরম মনের মানুষ হয়। তাদের একটি ফুল বা পাতা ছিঁড়তেও বড় কষ্ট হয়। আর সম্পর্ক তো...।

চাটান-এর কথার উত্তর না দিয়ে উসকি গুড়ুক্ গুড়ুক্ করে হুঁকো খেতে লাগল।

চাটান দাওয়ায় বসল পা ছড়িয়ে। বৃষ্টি থেমে গেছে অনেকক্ষণ। একাদশীর জ্যোৎস্নায় রাত ছম্‌ছম্ করছিল ধু-ধু টাঁড়ের মাঝে একটি-দুটি গাছকে ওই জ্যোৎস্নাতে অন্য কোনো দিশুম্-এরই বলে মনে হচ্ছিল। সেইদিকে চেয়ে চাটান কেমন যেন উদাস হয়ে গেল। তার খিদে-তৃষ্ণার কথাও সে ভুলে গেল।

উস্‌কি বলল, বর-বউ-এর সম্পর্ক কাকে বলে তুমি জানো?

কাকে?

তোমাকে বলেই বা কী লাভ?

তাহলে বলো না।

তোমার দোষ তুমি স্বীকার করো?

করি। সব দোষই তো আমার।

তবে মরো। আমি আর বসে খাওয়াতে পারব না তোমাকে চাটান। খেটে খেতে হলে, খাও। নইলে যাও। এখনই যাও।

কেন? এখনই কেন? আজ রাতটা শুয়েই থাকি বরং দাওয়াতে। আমি বড় ক্লান্ত উসকি।

কোনো ক্যানো ট্যানো নেই। এখনই যাবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে ওইভাবেই বসে রইল চাটান।

কী হল। যাচ্ছ না যে!

হুঁকোতে একটা টান দিয়ে উসকি বলল, আমি তোমাকে যেতে বলেছি, যাও। এ বাড়ি তো আমিই একদিন বানিয়েছিলাম। তুমি তাকে চিকন-পিণ্ডা করেছিলে শুধু। চাটান নিজেকে বলার মতো করেই বলল, উসকিকে শোনাবার জন্যে নয়। জানি। কিন্তু বাড়ি মানে তো দাওয়া-দেওয়াল-ছাদই শুধু নয়, বাড়ি মানে...

উসকির কণ্ঠ যেন বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এল।

আমিও তো সেই কথাই বলি।

কথাটা যদিও বলল চাটান কিন্তু উসকির জন্যে ভীষণই কষ্ট হল ওর।

তারপর আবার বলল, বড় খিদে পেয়েছে গো আমার।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে হুঁকো-খাওয়া থামিয়ে উসকি বলল, চাটান, তুমি কি কোনোদিনও বড় হবে না? চিরদিনই সেই বাঁশি-বাজানো মোষের-পিঠে-চড়া কিশোরটিই থেকে যাবে?

তাই তো চেয়েছিলাম। কিন্তু তা হল কই? বড় তো হতেই হল।

সিঙবোঙা করুন, তুমি খুশি হও। খুশি থাক। কিন্তু তুমি এখন যাও।

কোথায় যাব আমি এই রাতের বেলা? আমার যে ভীষণ খিদেও পেয়েছে।

যাও চাটান। গাঞ্জু ফিরে আসবে একটু পরই। ওকে আমিই আসতে বলেছি। রান্না করবে আমার। তুমি যাও, এত বড় দিশুম্। দিশুম্-এর পর দিশুম্। তোমার যেখানে ইচ্ছা চলে যাও চাটান। লক্ষ্মীটি। যার কাছে খুশি যাও। আমি কিছুই বলব না। শুধু আমাকে জ্বালিও না আর। দাদা বিয়ে দিয়েছিল এক শিশুর সঙ্গে আমাকে। কী কপাল!

এবারে চাটান উঠে দাঁড়াল। বলল, 'সাকামচারি' চাইবে না তুমি?

যে-কোনো মুহূর্তে। তুমিও চাইতে পার। তুমি পঞ্চায়েতের সামনে শালপাতা ছিঁড়ে আমার সঙ্গে সম্পর্ক যখন খুশি ছিঁড়তে চাও, ছিঁড়বে। আমি একবারও আপত্তি করব না। ধরে নাও, আমাদের সাকামচারি হয়ে গেছে। জীবন দুদিনের চাটান। এখানে একটি ভুল নিয়ে দাঁত কামড়ে পড়ে থাকার সময় কারও নেই এ'কথাটা যারা সময় থাকতে বোঝে, তারাই বেঁচে য়ায়। পড়ে থাকাটা উচিতও নয়।

চাটান উঠে পড়ে আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছিল।

উসকি পেছন থেকে ডেকে বলল, চাটান। শোন।

উসকির গলাটি খুব নরম। এবং অসহায় শোনাল এবারে। বিয়ের পর পর অন্ধকার রাতে যেমন শোনাতো। হুঁকো নামিয়ে নিয়েছিল সে মুখ থেকে। উসকি বলল, চিরদিনের মতোই যাও। আর ফিরে এস না কিন্তু। আবারও বলছি। তুমি যার কাছে খুশি যাও। আমি কিছুই মনে করব না। তোমার মতো করে তুমি সুখী হও।

উত্তরে কিছু না বলে, একটুক্ষণ চাটান উসকির মুখে চেয়ে রইল। তারপর বাইরে পা বাড়িয়েই ফিরে এসে তার শাবল আর বাঁশিটা তুলে নিল। শাবলটাকে কাঁধে ফেলে বাঁশিটাকে হাতে নিয়ে এবারে সত্যিই বেরিয়ে পড়ল চাটান। সত্যি-সত্যিই ধু-ধু জ্যোৎসনায় ধু-ধু টাঁড়ে চাটান মুণ্ডা তাজনা নদীর ধারের উসকির এবং তার নিজেরও অনেক যত্ন এবং ভালোবাসায় গড়া বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

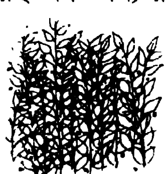
লণ্ঠনটার ফিতেটা খুব কমিয়ে দিয়েছিল উসকি। ভিতরের উঠোনে তখন একাদশীর চাঁদের আলো সাদা-কালো ছায়া-আলোর গরাদ এঁকেছিল। তারই মধ্যে বসে রইল উসকি, চাটান যেদিকে গেল সেদিকেই চেয়ে।

উসকির দু'চোখ ধীরে ধীরে জলে ভরে এল। ও স্বাধীনতা নিশ্চয়ই চেয়েছিল। কিন্তু এই আলো-ছায়ার পর্দা-ঘেরা স্বাধীনতা কি সত্যি-স্বাধীনতা? চাটান্‌কে তাড়ালেই কি ও স্বাধীন হবে? ও কেন যে

একটু নরম হতে পারে না, পারল না, অন্য দশটা মেয়ের মতো! চাটানকে পেলে যে-কোনো মেয়েই বর্তে যাবে, শুধু উসকিই পারল না ওকে নিয়ে খুশি হতে। ওর জেদ। ওর শুচিবায়ুগ্রস্ততা। ওর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব। এই সব...। তাড়াবেই যদি, তবে চাটান সত্যি সত্যিই যখন চলে গেল তখন ওর দুচোখ জলে ভরে এল কেন? ও জানে যে, চাটান আর কোনোদিনও ফিরে আসবে না। দাঁতে দাঁত চেপে উসকি প্রার্থনা করল যেন ওকে কখনও চাটান-এর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে না হয়। কোনোদিনও।

চাটান-এর আগে আগে হাওয়াটাকে পথ দেখিয়ে একটা টি-টি পাখি হুট্রিটি-হুট্ টিটিটিটিটিটিটিহুট করে ডাকতে ডাকতে উড়তে লাগল। তাকে দেখা যাচ্ছিল না, তার স্বর শোনা যাচ্ছিল শুধু। এবার উড়ছে চাটানকে পথ দেখিয়ে। এই পাখিগুলোর ডাক, এমন হাঁড়িয়ার-রঙের ফিকে জ্যোৎস্নার রাতে মনকে বড় উদাস করে দেয়। যে-দিগন্ত তখন দেখা যায় না, সেদিকেই হাঁটিয়ে নিয়ে যায় মানুষকে।

কোথাও একটা যেতে হবে। কোথায়, তা সে এখনও জানে না। চন্দ্রালোকিত টাঁড়ে নিজের ছায়া সামনে ফেলে ফেলে হেঁটে যেতে লাগল দীর্ঘাঙ্গ, সুদেহী চাটান। তাকে কোথাও একটা যেতে হতই। আজ আর কাল! সব পুরুষকেই যেতে হয়। ভিতরে ভিতরে সেই যাওয়ার তাগিদটা বোধ করছিল অনেকই দিন থেকে। আজ উসকিই সেই সুযোগটা জোর করে করে দিল। সেজন্যে মনে মনে ধন্যবাদ দিল উসকিকে। এই যাওয়া, ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে নয়, প্রিয় নারীর সান্নিধ্যের খোঁজেও নয়; এ একেবারেই এক অন্য রকমের যাওয়া।



●

টাংটাটোলির মংলু মুণ্ডার ছোট বোন উসকির বিয়ে হয়েছে তাজনা নদীর পাশের তাজনা বস্তিতে। এমন কিছু দূর নয় টাংলাটোলি থেকে। অথচ উসকি একেবারেই আসতে পারে না। এমনকী টাংলাটোলির হাটেও আসে না। জামাই চাটান-এর আর্থিক অবস্থা বড়ই খারাপ। দিনকে দিন খারাপতরই হচ্ছে। তাছাড়া মানুষটাও একটু অন্য ধাঁচের। কোনোদিনই ঘর-সংসারে মন ছিল না তার। বড় বড় চুল। হেঁয়ালি-হেঁয়ালি কথা বলে। কী করে সংসার চলবে সেদিকে কোনো খেয়ালই নেই। অথচ দিন-রাত্তির বনে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়, গাছ পোঁতে, নিজের সঙ্গে নিজে বিড়বিড় করে কথা বলে। যখন তা করে না, তখন হাঁড়িয়া খেয়ে বেহুঁশ। ভূতে ওকে টাকা জোগায়।

উসকিটা ছেঁড়া-শাড়ি পরে কাঠ-কুড়িয়ে, ডাল-কুড়িয়ে এর ওর বাড়িতে টুকটাক কাজ করে কোনোক্রমে দিন-গুজরান করছে এতদিন। অল্প ক'দিন হল তাজনার লাহি কোম্পানিতে কামিনের কাজ নিয়েছে সে। অবশ্য উসকির জন্যে দুঃখ হলেও মংলু কিছুমাত্রই করতে পারে না উসকির জন্যে। মা-বাবা মরে গিয়ে বেঁচে গেছে মেয়ের এ কষ্ট দেখার দুঃখ থেকে। নিজেরাও তো আহামরি কিছু থাকে না। সে-ও তো না-খেয়ে থাকারই মতো! জঙ্গল নষ্ট হয়ে যাওয়াতে ওদের প্রায় সব কিছুই নষ্ট হয়ে গেছে। সবচেয়ে বেশি যা নষ্ট হয়েছে তা তাদের মনের শান্তি। একদিকে বিপুল সরকারি ঔদাসীন্য এবং অন্ধত্ব, অন্যদিকে কিছুটা ঝাড়খণ্ডী আন্দোলনের কারণেও বন-জঙ্গল একেবারেই খতম হয়ে যাওয়াতে ওদের অবস্থা

বছরে বছরে ক্রমশ খারাপই হচ্ছে। আন্দোলন হচ্ছে ঠিকই কিন্তু সে তো আর বিরসা মুণ্ডার 'উল্‌গুলান'-এর মতো নয়। অন্য সব সমাজেরই মতো তাঁদের সমাজেও আর ঐক্য নেই। উদ্দেশ্যের মধ্যেও সাম্য নেই। আর্থিক অসাম্য, ভাবনা-চিন্তার অসাম্য, নানা মত ও নানা পথের পথিক করে তুলেছে তাদের। ঝাড়খণ্ডী রাজ্য হলেই যদি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত, তবে তো ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর পুরো দেশেরই সব সমস্যারই সমাধান হয়ে যেত! এখন যারা বুড়ো, তারা তো তাই-ই ভেবেছিল সেদিন। সময়ের ব্যবধানে উদ্দেশ্য, বিধেয় এবং তাদের রকমও পুরোপুরিই বদলে যায়। মংলু বোঝে এ কথা।

ছেলে-ছোকরারা যদিও চটে রয়েছে খুবই। তারা বলছে, অস্ত্র ধরবে এবারে। অস্ত্র কি মংলুরও ধরতে ইচ্ছে করেনি একসময়ে? যখন তারাও বয়সে ওই ছেলে-ছোকরাদের মতোই ছিল। করেছে। কিন্তু কিছু বয়স ও বিবেচনা হয়েছে বলেই এখন মধ্যবয়সে এসে বোঝে যে, টাঙি দিয়ে তারা কাটবেটা কাকে? তির দিয়ে বিদ্ধ করবে কি? পেটের খিদে ও নিজেদের বাঁচতে না-পারার দুঃখ, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় না-রাখতে পারার কষ্ট, জঙ্গল শেষ হয়ে যাবার কষ্ট, তাদের নিজেদেরই খণ্ডিত, বিদ্ধ করে দিয়েছে পুরোপুরিই। তাদের এত বছরের অভাব-অনটনের মূলে আসল শত্রু যে কে বা কারা তত্রা মংলু, সিন্নু, ডুইক্যা কী ঢিমারা নিজেরাই ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি।

তিরিডির সিরকা মুণ্ডা তো বলেই যে তারা নিজেরাও নিজেদের সঙ্গে কম শত্রুতা করেনি। যে-জঙ্গলের উপর তাদের জীবনযাত্রা পুরোপুরিই নির্ভরশীল ছিল, সেই জঙ্গলকেই তারা নিজে হাতে কেটে সাফ করে স্বল্পদিনের জন্যে বড়লোক হয়ে, তারপরই চুপসে গিয়ে থিতু হয়েছে। সিরকা বলে, ছাপ্পড়-ফোড় টাকা এমনি করেই হাটে-আসা বেলুনওয়ালার গ্যাস-বেলুনের গ্যাসেরই মতো ভুস্‌ভুস্‌

করে বেরিয়ে যায়। তাছাড়া, তাদের পুরোনো শান্ত, নিস্তরঙ্গ গরিব সৎ জীবনযাত্রার মধ্যে হঠাৎ এই তুফান-তোলা ফসলি-বটের, কামিনা শহুরেদের নকল-করা বড়লোকি তাদের মূল্যবোধের ভিত ধরেও প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে গেছে। শহরের লেখাপড়া শেখা মানুষগুলোর মধ্যে "ভালো" বলতে তো আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তারা সবাই টাঁড়ের শেয়ালের মতো ধূর্ত, ধাঙর, বদমায়েশ হয়ে গেছে। তাদেরই লোভের ছোঁয়া লেগেছে মংলুদের, ডুইক্যাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে। এই দাবানল থেকে ওদের বাঁচানো কি সম্ভব হবে আর?

সিরকা মুণ্ডার বড় ছেলে ডুইক্যার বউ কুরকি একথা জোরের সঙ্গেই বলে যে এ গ্রাম সে গ্রামের কিছু কিছু ছেলেমেয়ে ইংরিজি শি:খে আর প্যান্টুলুন পরে নিজেদের পুরোনো যা-কিছুই ভালো ছিল সব কিছুকেই খারাপ বলতে শুরু করেছে। কুরকি বলে, এদের সব চাণ্ডি-চুরিণ-এ ধরেছে।

ঢিমার বউ ঝিঙ্গি, মানে মুঙ্গরীর মা কিন্তু অন্য কথা বলে। বলে, বদলের আরেক নামই তো জীবন। পৃথিবীর কোন জায়গার লোকই বা আজ পুরোনো জীবন আঁকড়ে ধরে বাঁচছে? অবশ্য ঝিঙ্গির পৃথিবী মানে, মুর্হু আর খুঁটি। এই সময়ে, এই যুগে বাস করে কি আর ওইসব পুরোনো ধ্যান-ধারণা নিয়ে বাঁচা চলে?

দুই পুত্রবধূর কথাই শোনে মনোযোগ দিয়ে সিরকা মুণ্ডাও। কথা শুনে, দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে তামাক চিবোতে চিবোতে পিচিক্ করে থুথু ফেলে। সিরকা মুণ্ডার কথাগুলো যেন বহু বছর থেকেই রাতের তারাদের সবুজাভ দ্যুতিরই মতো, কোনো সুউচ্চ পাহাড়শ্রেণির গুহাগাত্রের বা প্রস্তরাশ্রয়ের ছবির বক্তব্যেরই মতো ঝিঙ্গি আর কুরকি আর তার স্বামীদের কাছে নেমে আসে, ঝরে পড়ে। এমনকী ভিন-গাঁয়ের মংলুদের কাছেও। সিরকা মুণ্ডা এদিকের জঙ্গল-পাহাড়ের বিশ-ত্রিশটা গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে মান্য লোক।

সিরকা মুণ্ডা যা কিছুই শিখেছে তার সব কিছুই মুণ্ডা সমাজের মধ্যে তার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই শিখেছে। তাই সিরকার কথাকে তার সমস্ত পরিবার, তার নিজের গাঁয়ের, আশপাশের অন্য গাঁয়ের মেয়ে-মরদে সম্মান করে। সে বৃদ্ধ হয়েছে বলেই যে শুধু বয়সের কারণেই সম্মান করে তাকে তাই-ই নয়; অভিজ্ঞতার, জ্ঞানের, সততার, পক্ষপাতিত্বহীনতার কারণেও করে। প্রাচীন যদিও, তবু সিরকা যথেষ্ট আধুনিকও। মুণ্ডা সমাজকে, ধর্ম-রীতি-নীতিতে অব্যাহত রেখে সবরকম আধুনিকতাকেই সে সমর্থন করে।

সিরকা বলে, প্রত্যেক প্রজন্মেরই তাদের নিজেদের মত ও বুদ্ধি নিয়ে স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার অবশ্যই আছে। তার নাতনি, এই মুঙ্গরীরা আর তার সমবয়সিদেরও সে অধিকার আছে। ওদের বাধা দিও না তোমরা। চলার পথ যদি ভুল বলে ওরা নিজেরাই কোনোদিন বুঝতে পারে, তবে ভুল পথে গেলে বুঝতে নিশ্চয়ই পারবে, চকিতে বাঁক নিয়ে ফিরে আসবে আবার। ল্যাজের দিকে ঘুরিয়ে নেবে মাথা, শঙ্খচূড় সাপেরই মতো; ত্বরিতে। তবে কোনোরকম লোভের সঙ্গে আপস করাকে ঘেন্না করে সিরকা। চিরদিনই ঘেন্না করে এসেছে।

প্রাচীন সিরকা মুণ্ডার এই "আধুনিকতা" পুরো মুণ্ডা সমাজই বোঝে। এবং বোঝে বলেই, বুড়োকে আরও বেশি করে সম্মান করে।

ডুইক্যা বলে, এবারে যে কী হবে!

কী হবে?

টিমা বলে।

সেই যে একদিন বৃষ্টি হল, তারপর তো আর দেখাই নেই মেঘের।

সিরকা মুণ্ডা তামাক চিবোতে চিবোতে বলল, কোনো মানুষের বা গোষ্ঠীর জীবনেই এমন কোনো ঘটনা কখনও ঘটতে পারে না, যার কোনো নজির নেই। যা আগে কখনও ঘটেনি। পুরোনো নজিরের কথা ভাবলে এ বছরের খরাটা তেমন অসহ্য বলে মনে নাও হতে পারে।

ডুইক্যা বলল, তখন যে পৃথিবী অন্যরকম ছিল, বাবা!

কীরকম ছিল?

তখন গাছ ছিল অনেক। প্রত্যেক পাহাড়ের ঝোপে-ঝাড়ে, বনে-গাছে আমাদের সব চাহিদার জোগান ছিল। তখন নদীতে জল বইত। বৃষ্টি হত এখনকার চেয়ে অনেকই বেশি। বৈশাখ মাসেও রাতের এই সময় দাওয়াতে বসলে একটা পাতলা দোহর গায়ে দিয়ে বসতে হত। রাতে হিমের আর ঠান্ডা হাওয়ার জন্যে বাইরে শোওয়া যেত না।

সিরকা মুণ্ডার বউ ঝারিও গুড়ুক গুড়ুক করে হুঁকো খেতে খেতে বলল, সেকথা ঠিকই বলেছে ডুইক্যা।

সিরকা মুণ্ডা আত্মদর্শন করেই যেন ঋজু-সমান কণ্ঠস্বরে বলল, সবই সত্যি। তা এমন সব হয়ে গেল কেন? কী করে? গতবছর বিরসা মুণ্ডার জন্মদিনে যে সুকানবুড়ু পাহাড়ের উপরের মেলায় তোরা গেছিলি মাঘী-পূর্ণিমাতে, সেই পাহাড়ে ক'টা গাছ দেখলি? আমি তো যেতে পারি না বহুদিনই।

ন্যাড়া! সব ন্যাড়া হয়ে গেছে।

ডুইক্যা বলল।

খুঁটি থেকে যে পথ সেন্দ্রা, সাইকো তামার হয়ে বুণ্ডু চলে গেছে সেই পথে আগে এমনই ঘন জঙ্গল ছিল যে, আমরা দিনের বেলাতেও দল বেঁধে ছাড়া যাওয়ার সাহসই পাইনি। তাও জোয়ান-মরদেরা সব। হাতে তির-ধনুক, টাঙি-বল্লম নিয়ে। ঠিক সেই রকমই জঙ্গল ছিল টেবো-ঘাটেও। বন্দ্‌গাঁওয়ের জঙ্গলই বা কীরকম গভীর ছিল! জিজ্ঞেস কর্ না তোর মাকে?

বলল সিরকা।

কী ঝারিও? ডুইক্যা তখন দশ মাসের শিশু। তখনও বুকের দুধ খায়। শখ করে, পাঁচ গায়ের জোয়ান-মরদ-মেয়েরা মিলে হাট করতে

গেছিলাম শীতের দিনে বন্দ্গাঁওয়ে একদিন। মাঘ মাস। হাট সেরে, খাওয়া-দাওয়া করে, দুপুরে রওয়ানা হয়েছিলাম ফিরতি-পথে তিরিডির দিকে। হলে কী হয়। দুপুর তিনটের সময়েই পথে ঘোর অন্ধকার। এমনই জঙ্গল। চাঁদ যখন ওঠার তখন উঠত, কিন্তু সূর্যের আলোই পারল না ঢুকতে। আর চাঁদের তো কম্ম ফতে! একে শীতের জাঁক। তার উপর সেই অন্ধকার পথে তখুনি পড়ল জোড়া-বাঘ। সামনে। পথের উপর জোড়-লেগেছিল।

একটু থেমে, তামাক-খাওয়া হুঁকো-হাতে সাদা-চুলের স্ত্রীর দিকে চেয়ে বলল, মনে আছে ঝারিও? কী কাণ্ড! কী কাণ্ড!

ঝিঙ্গি বলল, তার পরে?

তারপর আর কী! কোনোক্রমে সকলে মিলে তো প্রাণ বাঁচিয়ে বন্দ্গাঁও-এ ফিরে, এখন যে বন্দ্গাঁও-এর মুখিয়া, আনন্দ সিং; ইন্দিরা-কংগ্রেস করে; তার বাবার কাছে এসে আর্জি করলাম! তিনি বাজারের মধ্যেই তাঁর লাহির আর কুলের গুদামের লাগোয়া একটি ঘর খুলে দিলেন আমাদের সকলের জন্যে। বাজরা আর সবজি পাঠিয়ে দিলেন। সঙ্গে লাড্ডু। তার উপর এক হাঁড়ি মহুয়াও। শোওয়ার আর গায়ে দেবার জন্যে খড়। সে রাতে খাওয়াও জব্বর হয়েছিল। খাওয়া-দাওয়া সেরে, ঘরের সামনে আগুন জ্বেলে রেখে, সকলে একই ঘরে নিজেদের গায়ের ওম্-এর গরমে রাত কাটিয়ে দিলাম। তখন ঠান্ডাই বা কীরকম ছিল! আমাদের গ্রাম এই তিরিডিতেও তো গরম বোঝা যেত শুধুই বছরের দিন দশেক! একেবারে বর্ষা নামার আগে আগে।

আর এখন?

কুর্কি বলল।

এখন কেমন তা তো তোরা জানিসই!

যা বলেছেন। কুর্কি আর ঝিঙ্গি একসঙ্গে বলল।

সিরকা মুণ্ডা বলল, অন্যদের যেমন দোষ আছে, আমাদেরও আছে। এখন মুঙ্গরীদের বিয়ে হলে, তাদের ছেলে-মেয়েরা কী খেয়ে বাঁচবে, কেমন করে বাঁচবে, এই হচ্ছে সমস্যা। বড় বড় শহরের কারখানার তেল-কালিমাখা মজুর আর কামিনই হয়ে যাবে ওরা সব। আমাদের গ্রাম, আমাদের নিজস্বতা, আমাদের মুণ্ডা-সংস্কৃতি বলতে কিছুমাত্রই থাকবে না আর। আমাদের নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতি-ভাষা কিছুমাত্র থাকবে না, যদি-না এখনও তোরা সকলে বুঝিস। সাবধান হোস। অনেকই টাকা রোজগার করবে হয়তো মুঙ্গরীরা, তাদের ছেলেমেয়েরা, কিন্তু তা দিয়ে দুবেলা গম বা বাজরার রুটি আর একটা তরকারিও হয়তো হবে না। মাটির মতো দামি আর কী আছে? যার মাটি নেই তার কিছু নেই। গাই-বয়েলও থাকবে না কারও। তারা যে মুণ্ডা, বিরসা মুণ্ডার জাত, সেই গর্ব থাকবে না। তারা অন্য ভাষায় কথা বলবে, মিশে যাবে ভারতের আম-জনতার সঙ্গে। টাকা দিয়ে নানারকম জিনিস কিনবে শহুরে বাবুদের মতো। খাওয়া-দাওয়া আরাম-বিরামের ঢংই তখন বদলে যাবে। জামা-জুতোর কায়দা হবে।

ঢিমা বলল, তা বটে। কিন্তু বাবুজি বলছিলেন, এখন তো দিনকাল পাল্টেছে। আমরা সবাই এখন ভারতীয়। শুধু মুণ্ডা হয়ে থাকলেই বা চলবে কেন?

সিরকা মুণ্ডা খুব জোরে দুপাশে মাথা নেড়ে বলে উঠল, সেটা ভুল। কথাটাই ভুল বোধহয়। অনেকগুলো কথা একসঙ্গে তার মস্তিষ্ক থেকে মুখে ছুটে এল বলেই কথাগুলো জড়িয়ে গেল। তোতলার মতো সিরকা মুণ্ডা বলল, আমরা ভারতীয় হব বলেই আমাদের মুণ্ডাত্ব বিসর্জন দিতে হবে কেন? আমাদের যা-কিছু নিজস্ব সব কিছুই বাঁচিয়ে রেখেও তো আমরা ভারতীয় হতে পারি। তোকে বাবুজি যা বলেছেন, তা ভুল। অথবা এও হতে পারে যে, বাবুজির কথা তুই বুঝতেই পারিসনি!

আমাদের নিজস্বতা আর বাঁচিয়ে রাখতে পারলাম কই?

ডুইক্যার বউ কুরকি দুঃখের গলায় বলল।

কুরকি আর ডুইক্যার বড় মেয়ে কারখানারই একজন পাঞ্জাবি সর্দার ড্রাইভারের সঙ্গে ভেগে গিয়ে বিয়ে করেছে। মুরির কাছে বাসা নিয়েছে। ক্ষতটা এখনও টাটকা ছিল ওদের পরিবারে। দেড় বছর হয়ে গেছে। মেয়ে বাড়ি আসেনি একদিনের জন্যেও। তারও জেদ তো কম নয়। তার শরীরেও তো মুণ্ডা রক্ত বইছে। সমাজও তাদের জাতিচ্যুত করেছে। সমাজের চোখে তারা আর কেউই নয় ওদের। মুঙ্গরীর জন্যে এই জন্যেই এত ভয় ঝিঙ্গির।

এইসব কথাবার্তার মধ্যেই পাশের ঘরের মঙ্গলার ঘর থেকে নারী কণ্ঠের কান্না ভেসে এল।

ডুইক্যা উঠে গেল দেখতে। সঙ্গে সঙ্গে কুরকি আর ঝিঙ্গিও গেল। মঙ্গলার বউ ময়না কাঁদছিল তার গাইটা ঘরে ফেরেনি বলে। কেঁদে কেঁদে বলছিল, মূয়া-ভূতে ধরেছে তার গাইকে।

সিরকা মুণ্ডা দাওয়াতে বসেই ময়নার তীক্ষ্নস্বরে বলা কথাক'টি শুনেছিল। নিজের মনেই ভাবছিল, কে জানে! হয়তো মূয়াতেই ধরেছে। কিন্তু আজকাল তো আর গ্রামের কাছে গহন বন নেই যে, বাঘে বা চিতাতেও ধরবে গাইকে। চারদিক তো প্রায় টাঁড়ই হয়ে এসেছে! যে ক'টা গাছ বেঁচে আছে তা গ্রামের মধ্যেরই গাছ। আম, কাঁটাল, মহুয়া, জামুন, চাঁড়, নিম, করৌঞ্জা, কদম্ব, চাঁপা, বট, অশ্বত্থ এইসব। গ্রামের সীমানার ঠিক বাইরেই বড় বড় পাথরের কালো কালো স্তূপ ছিল। টিলা। কালো ছাড়াও, ধূসর, সাদাটে, ফিকে, হল্‌দেটে পাথরের স্তূপ ও টিলাও ছিল। ঠিকাদারদের লোক এসে সেইসব পাথরও ডিনামাইট দিয়ে কাটিয়ে গাঁইতি দিয়ে কেটে কেটে বয়েল-গাড়ি আর লরি করে চালান দিয়েছে রাঁচি বা চক্রধরপুরে। সব সমান করে দিয়ে গেছে। কার অনুমতিতে এ সব করছে, কাকে ঘুস দিয়ে; তা সিরকা জানে না। তবে এটা ঠিক যে, পুরোনো পৃথিবীকে তারা একেবারেই ন্যাংটো করে ছেড়ে দেবে এই পণই নিয়েছে।

তাজনা নদী একসময় পাথরের আর বালির জন্যে বিখ্যাত ছিল। গ্রীষ্মকালে নদীর পাথরগুলোকেও পর্যন্ত ওইভাবেই ভেঙে গুঁড়িয়ে কেটে নিয়ে গেছে ঠিকাদারেরা। বালিও নিয়ে যায় প্রতি বছর তবে নদী প্রতি বর্ষায়ই তার অনন্ত ভাণ্ডার থেকে বালি বয়ে আনে। মানুষের লোভ বড় বেড়ে গেছে। বড়ই সর্বগ্রাসী হয়ে গেছে মানুষ। "খুম্বুরু-জুম্বুরি"র চূড়ান্ত। বড় ভয়ংকর এর পরিণাম! বোঙারা যে চটেছেন তার প্রমাণ এবারের গ্রীষ্মই! ছেলেদের, ও যাই বলুক না কেন। তবে এ কিছুই নয়। খরা, মরুভূমি, অসময়ের প্রবল বৃষ্টি, অসময়ের বান, ভূমিকম্প এই সবই একদিন কড়ায়-গণ্ডায় দিয়ে দেবে মানুষকে মানুষের লোভের শাস্তি। সিরকা বেঁচে থাকবে না ততদিন। কিন্তু ডুইক্যা, ঢিমা, কুরকি ও ঝিঙ্গি না বাঁচলেও মুঙ্গরীরা ঠিকই বাঁচবে। বড় নিষ্ঠুর, নির্দয়, বড় তাপিত হবে সেইদিন।

একটু পরেই ডুইক্যারা ফিরে এল। তারপর মেয়েরা রয়ে গেল। সিরকার দুই ছেলে চলে গেল গ্রামের অন্যদের সঙ্গে মিলে মশাল আর লণ্ঠন হাতে জ্বেলে মঙ্গলা আর ময়নার গাইকে খুঁজতে! মূয়া-ভূতে ধরলে কি আর গাইকে এখুনি পাবে?

মূয়াও হচ্ছে চাণ্ডি-চুরিণ-এরই মতো ভূত। চাণ্ডি হচ্ছে পুরুষ ভূত, আর চুরিণ মেয়ে ভূত। ওরা গাছে থাকে বা পাথরে। গাছ ও পাথরের অস্তিত্ব প্রায় লোপ পেতে বসেছে তাই এখন চাণ্ডি-চুরিণ ভূত যে কোথায় থাকে তা তারাই জানে। কিন্তু তারা রাতের বেলা বেরোয়। কোনো মানুষের সঙ্গে দেখা হলে, তাদের উপরে ভর করে। এমনিতে দেখতে মানুষ-মানুষিরই মতো। কিন্তু কখনও কখনও কুকুরের, বয়েলের, হাতি, শুয়োর বা বাঘ ইত্যাদির রূপেও দেখা দেয় এরা।

ওরা চার-পাঁচজনে দল বেঁধে এগোচ্ছিল। মঙ্গলা বলল, গ্রামের চারধারে এক চক্কর লাগিয়েই ফিরে আসব। ভূত-প্রেতের ভয় ছিল, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন।

ডুইক্যা বলল, কত রকমের ভূত ছিল বল্ দেখিনি।

তা আর বলতে।

ঢিমা বলল।

খুটকাট্টি ভূত! সবচেয়ে বড় ভূত। বুড্ডুবোঙ্গা, ইকির-বোঙ্গা। আর মূয়া-ভূত তো ছিলই। মানুষের মতো দেখতে। জঙ্গলে মূয়া-ভূত বাঘ পালে, হরিণ চড়ায়। জংলি সব জানোয়ারদের পালক সে। কেউ গাছে থাকে, কেউ পাথরে কিন্তু দেখা দেয় মানুষেরই রূপে। বড় বড় চোখ দুটি আগুনের মতো জ্বলে চুরহিণের। বড় বড় নখ। লম্বা লম্বা চুল। জঙ্গলে গ্রামের কোনো গোরু-বয়েল-বক্‌রি হারিয়ে গেলে মূয়া-ভূত তাদের লুকিয়ে ফেলে।

ঢিমা বলল, আজকাল আর তেমন তাঁরা তংক্ করেন না। যখন করতেন, তখন তো এবেলা-ওবেলা ভগতদের কাছে যেতে হত। গ্রামের লোকেরা মিলে ভগতের কাছে গেলে ভগতরা যেমন বলত। তেমনই করতে হত। মূয়াকে খৈনি বা বকরি বা মুরগি এসব নিবেদন করে প্রার্থনা করতো, "মূয়া" যেন তাদের গৃহপালিত পশুকে ছেড়ে দেয়।

চলতে চলতে ঢিমা হঠাৎ গান জুড়ে দিল। অন্যেরা গলা মেলাল। ঢিমার গলায় সুর আছে। এখনও ওদের গাঁয়ের তো বটেই বহু ভিন-গাঁয়ের ভিন-বয়সি মেয়েরা ঢিমার গান শুনে তাকে পিরিত জানায়। ওর গলা প্রায় মংলুর ভগ্নিপতি চাটান-এর মতোই সুন্দর। ঝিঙ্গি তাই সবসময়ই চোখে চোখে রাখে ঢিমাকে।

ঢিমা গাইতে লাগল।

কিছুটা সামনে টাঁড়ের মধ্যে কতগুলো কুসুমগাছের জটলা ছিল। তার পরই শালগাছেদের জটলা। "সেরনা"। এই গাছগুলোর নীচেই তাদের সভা বসে। বিশেষ বিশেষ উৎসবে খানা-পিনা নাচা-গানা হয়। একসময়ে সেখানেই নিশ্ছিদ্র শালবন ছিল। সারহুল উৎসব হয়

এদেরই মধ্যের সবচেয়ে বুড়ো শালগাছের তলাতে। সেই দিকে আলো ফেলতেই টর্চের আলোটা মনে হল যেন নিভে গেল বা কেউ সব আলো নিমেষে শুষে নিল। হারিয়েই গেল আলোটা। মস্ত মস্ত বড় কালো পাথরের স্তূপের মধ্যে।

এখানে তো কালো পাথর ছিল না। কোনোদিনই ছিল না।

ডুইক্যা বলল। অবাক গলায়।

পরক্ষণেই ঢিমা চিৎকার করে উঠল, মুয়া! মুয়া!

মঙ্গলা বলল, হাতির রূপ ধরে এসেছে রে!

পালা! পালা!

ওরা দৌড়ে গ্রামের দিকে ছুটে চলল।

এদিকে যখন জঙ্গল ছিল, কুড়ি বছর আগেও, তখন হাতি দেখা যেত। তাও শুধু ফসলের সময়েই। এই প্রায় টাঁড়ের মধ্যে হাতি আসার কোনো বাস্তব সম্ভাবনাই নেই। তাই এই হাতি বা হাতির দল মুয়া অথবা মুয়া-পালিত। অবশ্যই।

দৌড়াতে দৌড়াতে গ্রামের কাছে এসে শানিচারোয়া বলল, মঙ্গলা, তোর গাইকে কাল খুঁজব!

ডুইক্যা বলল, অনেকদিনই আমরা পুজো-টুজো দিইনি। একই সঙ্গে বুড়ুবোঙ্গা, ইকির-বোগ্ঙা, চাণ্ডি-চুরিণ, মুয়া এবং জলের ভূত নাগে-বোঙার পুজোও দিতে হবে। এ বছর যা খরা আর গরম, অসুখ-বিসুখ লাগল বলে।

ছুটতে ছুটতেই অন্যেরা সকলে সমস্বরে বলল, ঠিক ঠিক।



●

সকালবেলা সুগী আর মুঙ্গরী কাজে যাচ্ছিল কারখানায়।

সুগী আগে আগে, প্রায় নাচতে নাচতেই; গাইতে গাইতে যাচ্ছিল। মেয়েটা পাগলী আছে বেশ। তবে এই বৈশাখি সকালের একটা নেশাও আছে। এই ভোরের হাওয়ার। যারা জানে, তারা জানে। শেষ বৈশাখেও ভোরের হাওয়া, ভোরের হাওয়াই!

সুগী গাইছিল সারহুর-এর গান। শালবীথি "সেরনা" তে যে "সারহুল" হয়ে গেল ক'দিন আগে, তারই গান।

"শুশুনকরাম মেতেং হারামাতালেনা
শুশুনকরাম মেদন্ হিয়াতিঙ্গিয়া
পিটিপালানে রেনসেনা বুধি লেনা
পিটিপালানে নেদং চাকাতিঙ্গিয়া
এরাগিংরেওগাপে সেগেদিংরেয়োপেগা
শুশুনকরাম মেদন হিয়াতিঙ্গিয়া
এরাগিংরেওগাপে সেগেদিংরেয়োপেগা
পিটিপালানে নেদং চাকাতিঙ্গিয়া।"

মুঙ্গরী হাসছিল, গানের মানে মনে করে। মানেটা হল, নাচ দেখে দেখে আমি বড় হয়েছি, আমি নাচা ছাড়ব না। বাজার-হাটে ঘুরে ঘুরে আমার বুদ্ধি হয়েছে; আমি বাজার-হাটে যাওয়া ছাড়ব না। আমায় বক্ বা মার তবুও নাচ ছাড়ব না। বাজার-হাটে যাওয়াও ছাড়ব না।

এই গানের পরই সুগী অন্য আর একটি গান ধরে দিল।

"এঙ্গানআপুনকিন্ যো কাজুরি

আনাআড়ে জিকুরাম্‌বেন মারাংকিঞা
চিলিকাতে পাড়ি হালাবিনা...।"

মুঙ্গরি বলল, ঢঙ দেখে মরে যাই তোর! এদিকে পর-ঘরে তো যাওয়ার জন্যে এক পা বাড়িয়েই আছিস।

ওই গানটার মানে হল, বাবা-মা সকলেই তো জোড়ে-জোড়েই আছে। তারা আমাকে অনেকই আদর করে বড় করেছে শিশুকাল থেকে। আমার জীবনে আমি মা-বাবার ভালোবাসা ছাড়া কিছুই জানিনি। কিন্তু এখন এই স্নেহ-মমতা ছেড়ে আমি কি করে অন্য ঘরে যাব?

তারপর আবারও গাইল সুগী। আজকে ওকে গানে পেয়েছে। কেন যে, তা পরে বুঝল মুঙ্গরী।

"হাড়ামজানবেদো গাবেনবুড়িয়া জানরেদো
গাড়াদাদোগান্‌ আনুবেনগিয়া।
জিয়ানজানরে দোগাবেন দুড়ুম জানরেদো
আঁড়েইলিদগো দোড়মাবেনগিয়া।"

মানে বাবা বুড়ো হয়ে গেলে, মা বুড়ি হয়ে গেলে, আমি ওদের জল খাওয়াব। বাবা-মা মরে গেলে হাঁড়িয়া দিয়ে মা-বাবার পুজো করব।

মুঙ্গরী বলল, তা তো করবি। কিন্তু ওই দ্যাখ বটগাছের তলায় মোটর-সাইকেল নিয়ে কে দাঁড়িয়ে আছে। কাজটা কিন্তু তুই ভালো করছিস না সুগী। মুরহুর এই লাহি কারবারির "দিকু" ব্যাটা তোকে বিয়ে করবে না ছাই। তোকে ব্যবহার করেই ছুঁড়ে ফেলে দেবে। এটা আমার কথা নয়। সকলেই বলে, তাই বললাম। তুই কি সিঙবোঙার আল ভাঙবি?

সুগী বলল, তুই চুপ কর। আমার ব্যাপার আমি বুঝব। ব্যবহৃত হলে তবেই তো ব্যবহারের মজাটা বুঝতে পারতিস। মরেও সুখ রে!

মরেও সুখ। তাছাড়া তোর মতো গোলমেলে পিরিতে আমি নেই। তোর সঙ্গে আমার তফাত আছে।

মুঙ্গরীর মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। "ব্যবহৃত" সেও হয়েছে। কিন্তু সে এক স্বর্গীয় ব্যবহার। সুগী কি বুঝবে?

ও বলল, আমি এ দিক দিয়ে এগোচ্ছি কারখানার দিকে। "ভোঁ" ওই বাজল বলে।

সুগী বলল, "ভোঁ"র তো এই শুরু রে! এর পর তো জীবনভরই ভোঁ। কারখানার ভোঁ, স্বামীর ভোঁ, ছেলে-মেয়ের ভোঁ, শেষে ভোঁ-ভাঁ।

মুঙ্গরীর সঙ্গে মূরহু বাজারের লাহির পাইকারের ওই ছেলেটা কথা বলে না। মুঙ্গরীর চেহারায়, চোখের দৃষ্টিতে, চলনে-বলনে এমন কিছু একটা আছে যে, সে নিজে থেকে কথা না বললে কারও সাহস হয় না ওর কাছে ঘেঁষতে বা কথা বলতে। কারখানার বুজুবাবুই বোধহয় একমাত্র ব্যতিক্রম। তবে বুজুবাবু বুজুবাবুই। কিন্তু মুরহুর লাহির পাইকারের ছেলের, এইসব "দিকু" ছোকরার নতুন পয়সা ছাড়া আর কী আছে? তাও আবার "গাছোয়াল"-ঠকানো পয়সা, মেহনতের কামাই নয়। মুঙ্গরী এও জানে ভালো করেই যে, সুগীর সঙ্গে তারও অনেক তফাত আছে। এবং থাকবেও। সুগীর রুচি আর তার রুচিও একরকম নয়। সে যে সিরকা মুণ্ডার নাতনি, এই কথাটা মুঙ্গরী কখনওই ভুলে যেতে চায় না। বলগির বাগোটের মতো ছেলেকেই তার শেষে মনে ধরল না। এমনকি বুজুবাবুকেও! আর এরা তো সব হেঁজি-পেঁজি!

টাংলাটোলির উসকি পিসির বর চাটান মুণ্ডাকে দেখলেই যেন মুঙ্গরীর সমস্ত শরীর-মন কেমন করে ওঠে। চাটান-এর মতো আর একজন পুরুষকেও ও দেখেনি এ অঞ্চলে। আপনভোলা, জামাকাপড়ের খেয়াল নেই; নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা আছে। সেই খুঁটির

মান্দকাম্‌ড়ি, দান্তিয়া, কামাস্তা, শালিহেতু, পাত্রাড়ি, বঙ্গো, তাজনা বস্তি; মুরহুর কাছাকাছি চারিত, ইন্ঠে, পোকলা, টাংলাটোলি, অনিগরা, দূরের বান্দে, সুরুন্দা, গোড়াটুলি, চুরুরী, যাত্তেবিন্দা, কুরচি, সিয়াংকেল, বন্দগাঁও কী টেবোরও কোনো হাটেও চাটান মুণ্ডার মতো একজনও পুরুষকে দেখেনি মুঙ্গরী। তাকে তার শরীর মন সব সমর্পণ করেও কোনো অনুতাপ হয়নি। বরং ধন্য মনে হয়েছে।

উসকি পিসি অতি সাধারণ চাটান্ মুণ্ডার তুলনাতে। অন্য দশটা মেয়েরই মতো। চাটান মুণ্ডা যদি বুড়ো বয়স অবধি বেঁচে থাকে তবে সিরকা মুণ্ডারই মতো সম্মান পাবে এই অঞ্চলের সব মুণ্ডাদের কাছ থেকে। মুঙ্গরী, সিরকা মুণ্ডার নাতনি হিসেবে নিজেকে যেমন গৌরবান্বিত মনে করে, চাটান মুণ্ডাকেও তার নিজের রূপ ও গুণেই তেমনই গৌরবান্বিত বলে মনে করে। চাটান ভালো কী মন্দ তা মুঙ্গরীএখনও নিশ্চিত জানে না কিন্তু এ কথা অবশ্যই জানে যে, চাটান আর অন্য একজনের মতো নয়।

সুগী ওদিকে চলে গেল। ভোঁও বেজে গেল। আজকে মেট্-এর গালাগালি খাওয়া কপালে আছে ওর। বেশ ক্ষ্যাপাটে ওই মেট। মাইকেলবাবুকে একাধারে ইলেকটিরির কাজ, যন্ত্রপাতির কাজ, কুলি-কামিন সামলানোর কাজ, সবই করতে হয়। সমস্তক্ষণ সারা কারখানা এবং অফিসেও ছড়ি ঘুরিয়ে বেড়ান তিনি। নিজে হাতে কাজও করেন যখনি প্রয়োজন হয়। টিমা মুণ্ডা ওঁরই নীচে কাজ করে। মাইকেলবাবু কালি-ঝুলি মেখে ঘুরে বেড়ান। দুর্বলতার মধ্যে একটিই। মাছ খাওয়া। এ দিকে ফ্যাকটরির মধ্যে নিরামিষ। ছুটির দিনে, বিশেষ করে বর্ষাকালে, চলে যান দূরে দূরের পাহাড়তলির পুকুরে বা নদী-ঝোড়াতে। ছিপ বা জাল হাতে করে। মাছ ধরে এনে সন্ধেবেলা নিজেই রসিয়ে রাঁধেন। কোনোদিন-বা বউকেও রাঁধতে দেন।

ঢিমা মুণ্ডা তো লাহি কারখানাতেই কাজ করে। তার মেয়ে মুঙ্গরিও করে। বাপ-বেটিতে মিলে যা হোক কিছু ঘরে আনে। এদিকে তার দাদা ডুইক্যার ওপরে পারিবারিক খেতি-জমিন দেখার ভার। কতটুকুই বা জমিন! আর দেখবেই বা কী? এ বছরে বলদ দুটোর হাল দেখলে কান্না পায়।

ডুইক্যার বাবা সির্‌কা মুণ্ডা বলে, অনেক পাপ জমেছে রে ডুইক্যা। আমাদের অনেকই পাপ জমেছে। যে সিঙবোঙা আমাদের খাওয়ার, ফল-মূল, লতা-পাতা, শাক, হরিণ, খরগোশ, শুয়োর, নদীর জল, পাহাড়তলির ছায়া সবই দিয়েছিলেন দু-হাত ঢেলে, কোনো কিছুরই অভাব রাখেননি এই পৃথিবীতে, আর সেই পৃথিবীকেই আমরা নিজে হাতে শেষ করে দিলাম। আমাদের কপালে অনেকই দুঃখ রে ডুইক্যা!

এ বছরে গাঁয়ের কুয়োর জল এতোই নীচে নেমে গেছে যে আর ক'দিনের মধ্যে ভালো বৃষ্টি না হলে শুকিয়েই যাবে কুয়ো। জ্যৈষ্ঠ শেষ হয়ে আষাঢ় আসার সময় হল। খাওয়ার জলই থাকবে না, আর চাষবাস!

সকাল আটটা থেকে আকাশ থেকে আগুন ঝরছে। এখন সকাল এগারোটা। খেত-জমিনের অবস্থাটা দেখতে এসেছিল ডুইক্যা। তাজ্‌না নদী এখান থেকে অনেকই দূরে। সেখান থেকে চাষের জল যে আনবে তারও সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া নদীর জলও শুকিয়ে এসেছে। রাত এগারোটা-বারোটা অবধিও হাওয়া তেমন ঠাণ্ডা হয়

না। তেমন বেশি গাছও নেই আজকাল তাদের তিরিডি গ্রামেও যে তার ছায়াতে একটু বসে জিরোবে ডুইক্যা। ঠিকাদারের জাত ভাইয়েরা তো সরকারের সব বিভাগের সঙ্গে মিলে মিশে রাঁচী-সিংভূমের জঙ্গল সব শেষই করে দিয়েছে অনেকদিনই হল। এখন ঠিকাদারদের লোভের লম্বা জিভ এগিয়ে এসেছে গ্রামগুলোকেও ন্যাংটো করে একেবারে ছায়াহীন করতে। ডুইক্যাদের দিশুম, সকলের দিশুমকেই মরুভূমি না-বানানো পর্যন্ত ওদের জিভের লালা ঝরবে। এ অঞ্চলের সব গ্রামের বেশির ভাগ মানুষই গরিব। অসুখ হলে, কী বয়েল মরে গেলে, কী ছেলেমেয়ের বিয়ে ঠিক হলে টাকার দরকার তো পড়েই! আর ঠিক তখনই ধুঁকতে-থাকা আহত-বাঘ বা বুড়ো-বয়েলের চারধারের গাছের ডালে ডালে যেমন নির্লজ্জ কুৎসিত শকুনিরা এসে ঘিরে বসে তেমনি করেই এই হরভজন কিংবা অন্য ঠিকাদারেরা এসে গ্রামের মধ্যের পুরোনো আম বা মহুয়া বা চাঁর বা জামুন বা কাঁটাল গাছের দর দেয়। দর শুনে ডুইক্যার মতো অতি স্বল্প সঞ্চয়ের মানুষদের মাথাই ঘুরে যায়। এই বিনা যত্নে বেড়ে-ওঠা এতদিনের আপাতমূল্যহীন গাছেদের হঠাৎই অন্য চোখে দেখতে পায় তখন ওরা। নিজের সর্বনাশ করে, নিজের সন্তানদের সর্বনাশ করে, নিজেদের পুরো পরিবেশের বিনাশ ঘটিয়ে পুরো ভবিষ্যৎ-এর বিনিময়েই বিক্রি করে দেয় ওরা ওদের বর্তমান। বাস্তু গাছ। মানুষে বাস্তু সাপকেও আদর করে রাখে, তার গায়েও হাত দেয় না, কিন্তু এখন অভাবের তাড়নাতে বহু পুরুষের সাক্ষী, বহু পুরুষকে ছায়া-দেওয়া বাস্তুগাছকে পর্যন্ত তুলে দিচ্ছে ওরা 'দিকু' ব্যাবসাদারদের কাছে। টাকা আর টাকার লোভ ছুলোয়া করে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওদের পরম সর্বনাশের দিকে।

সরকারি পথের পাশের দুপাশে যেসব গাছ আছে, পুরোনো পুরোনো সব প্রকাণ্ড গাছ; ভগয়ান বিরসার শত্রু ইংরেজদেরই

লাগিয়ে যাওয়া; শিমুল, মেহগনি, কৃষ্ণচূড়া, জ্যাকারান্ডা, অ্যাকাসিয়া, নানা জাতের সেই গাছগুলোর গা থেকেও আজকাল টাঙি দিয়ে ছুলে ছুলে বাকল আর কাঠের চাঙ্গড় বের করে, ভাগা বেঁধে মাথায় করে হাটে নিয়ে যাচ্ছে এদিক-ওদিকের গ্রামের মানুষেরাই বিক্রি করার জন্যে। মুরহু বা খুঁটি বা বন্দগাঁও-এর ইংরিজি লেখাপড়া-শেখা বাবুরা, মুখিয়ারা, রাজীব-কংগ্রেসওয়ালারা, কম্যুনিস্টো পার্টির লোক, জনতা পার্টির লোক, এমনকি ঝাড়খণ্ডী নেতারাও সেই কাঠ জ্বালিয়েই চা খাচ্ছে; খানা পাকাচ্ছে। তাদেরই মধ্যে কেউ কেউ তাদের ইংরিজির তুবড়ি ছুটিয়ে খবরের কাগজের সম্পাদকদের কাছে গাছ কাটা যে কত বড় অন্যায় সে সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। এ খবর অবশ্য ডুইক্যা জেনেছে দিল্‌ধড়কান্‌ পাণ্ডে বাবুর কাছ থেকে।

নাঃ। ডুইক্যা তার এক টুকরো ঊষর প্রায়-ফুটি-ফাটা হয়ে আসা ছায়াহীন জমির উপরে দাঁড়িয়ে আগুনের হলকার মতো হাওয়াটার সঙ্গে তার দুটি চোখের সব আর্দ্রতা দিয়ে মোকাবিলা করতে করতে তুঁতে রঙের আকাশে চেয়ে মনে মনে বলছিল, হায় দেবতা হারাম! তুমি কি এই গর্বিত সুন্দর মুণ্ডা আর মুণ্ডাইনদের এই জন্যেই সৃষ্টি করেছিলে? এনেছিলে এই পৃথিবীতে?

একটু দূরেই খুঁটিতে যাওয়ার পিচের পথ। আগুনের মতো হল্‌কা উঠছে তা থেকে। বড়জুর মিশানে যাওয়ার লাল মাটির পথটি যেখানে এসে পিচের রাস্তায় মিশেছে সেখানে দুটি বড় বড় গাছ আছে এখনও। ঠিক সেই মোড়েরই অসমান জমির উপরে কতগুলো বড় বড় পাথরও ছিল। কালো। দিন সাতেক আগেও ছিল। স্পষ্টই মনে আছে ডুইক্যার। ঠিকাদারেরা সেই পাথরগুলোকেও ব্লাস্টিং করে টুকরো করে ভেঙে নিয়ে জমি সমান করে দিয়ে চলে গেছে। স্টোনচিপস বানাবে। প্রকৃতির আর কোনোই বৈশিষ্ট্য থাকবে না কিছুদিন বাদে। পাহাড়গুলোও বোধহয় এমনি করে নিশ্চিহ্ন হয়ে

যাবে। চারদিকে হৈ! হৈ! রৈ! রৈ! করে কর্মযজ্ঞ চলছে। এই কর্মযজ্ঞ কিসের জন্যে তা ডুইক্যা বোঝে না। হাজার হাজার বাড়ি উঠছে। নদীর বালি আর পাথর, জঙ্গলের পাথর, মাঠের পাথর, পাহাড়ের ছোটবড় সব গাছ প্রত্যেকেরই প্রাণ উৎসর্গিত হয়েছে এই যজ্ঞে।

ডুইক্যা মুণ্ডা ভাবে, আসলে, এখন আর কারও দু'দণ্ড বসে এ সব কথা ভাবারই সময় নেই। দৌড়াচ্ছে সবাই-ই। একজন যেদিকে দৌড়াচ্ছে সকলেই সেইদিকেই দৌড়াচ্ছে। কেউ থেমে দাঁড়িয়ে সামনের বা পেছনের জনকেও শুধোচ্ছে না যে কেন দৌড়াচ্ছে তারা? কিসের খোঁজে?

ডুইক্যা পায়ে পায়ে হেঁটে বুডজুর মিশানের দিকের রাস্তার মোড়েই এসে দাঁড়াল। মোড়ের মাথায় একটি মস্ত চাঁর গাছ। সেই গাছতলায় তিনজন মুণ্ডাইন হাঁড়িতে হাঁড়িয়া বিক্রি করছে।

ওই খাঁ-খা গরমে তেষ্টা পেল ডুইক্যার। অবশ্য হাঁড়িয়া দেখলেই পায়। এক পয়সাও নিজস্ব রোজগার নেই। টিমা আর মুঙ্গরী যে চব্বিশটি টাকা আনে দিনশেষে তাই এখন তাদের পুরো পরিবারের রোজগার বলতে গেলে। কিন্তু হাঁড়িয়া দেখে ডুইক্যা তার বাপের নাম পর্যন্ত ভুলে গেছে চিরদিনই। গুটি গুটি হেঁটে গিয়ে বসল সে চাঁর গাছের ছায়ায়। দেখল যে, এই এলাকার চৌকিদার ভোঁঞ্জও এসে বসেছে। তার ঝিং-চ্যাক্ সাইকেলটা শালের খুঁটিতে হেলান দিয়ে রেখে, শালপাতার দোনা করে হাঁড়িয়া খাচ্ছে সে। সবশুদ্ধু প্রায় জনা-দশ-পনেরোজন মেয়ে-মরদ। চারিত, ইষ্ঠে, পোক্লা, টাংলাটোলি, অনিগ্ৰা এইসব গ্রামের মানুষ। হাস্‌সা আর তিরিডিরও একজন করে আছে। আকাশে যতই আগুন থাক, এখানে ছায়া আছে।

ডুইক্যাকে দেখে চৌকিদার ভোঁঞ্জ বলল, এস এস বস্‌সো ডুইক্যা দাদা। তোমার টিমা ভাইয়ের মেয়ে মুঙ্গরীটা ভারি ডাগর হয়েছে হে। আমার ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে নাকি?

ডুইক্যা কথা ঘুরিয়ে বলল, সে তো আমাদের পরম সৌভাগ্য। তবে জানো তো চৌকিদার সাহেব, আজকালকার মেয়ে। নিজের পছন্দটাই তো আগে।

ওর নিজের পছন্দের কেউ আছে নাকি?

হাঁড়িয়া বিক্রি করছিল বুদনি আর ফুলমণি। তারা একই সঙ্গে হেসে উঠে বলল, হায়! হায়! মাত্র একজন? কেন? তোমার নিজের সে বয়সের কথা বুঝি মনে নেই চৌকিদার? তোমাদের মনেও কি শুধু একজনই ছিল?

মুহূর্তের মধ্যে কী যেন কথা চালাচালি হল চৌকিদার আর ফুলমণির মধ্যে চোখে চোখে।

চৌকিদার অনেকক্ষণ ধরে খাচ্ছিল। নেশা বেশ চড়েছে। ভ্যাবলার মতো হেসে বলল, থাকবে না কেন? মনে থাকে। থাকে হেঃ হেঃ। হেঃ। হেঃ হেঃ হেঃ।

ক্রমশ জোর-হওয়া ঝড়ের মতো, আগুনের ঝলকের মতো হাওয়াটা দমকে দমকে ধুলো আর শুকনো ফুল-পাতা উড়িয়ে তাড়িয়ে নিয়ে আসছে। এই হাওয়া জুন মাসে প্রতিবছরই বয় কিন্তু জ্যৈষ্ঠের শেষে এমন অবস্থা বহু বছরই হয়নি।

সব উল্টে পাল্টে গেল হে ডুইক্যা। নিয়ম-কানুন সবই উল্টে পাল্টে গেল। খরার সময় বৃষ্টি হবে, বৃষ্টির সময় খরা। শীতের সময় গরম, গরমের সময় ঠাণ্ডা। খরা চলবে বর্ষাকাল পর্যন্ত। তারপর বর্ষা যখন নামবে তখন সব ভাসিয়ে দিতে থাকবে শরতের শেষ অবধি। গতবার তাজনা নদীতে কতবার বান এসেছিল মনে নেই?

টাংলাটোরির মংলু বলল, মানুষের লোভ যেসব সীমা ছাড়িয়ে গেছে। বনের মানুষ আমরা, বন নাই, শিকার নাই, বনের ফসল নাই, বৃষ্টি নাই, ছেলেমেয়েরা লাল-নীল পেন্টুলুন পরে শহরে-শহরে বাবু আর কুলি-কামিন হয়ে গেছে। শহরের বাবুদের মতো "সব চাই"-এর

লোভ জেগেছে মনে। “গোম্‌কে” তো আমাদের এই জীবনের জন্যে তৈরি করেননি। পাপ করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে বৈকি! “খুম্বুরু-জম্বুরি”-র দাম দিতে হবে না?

এমন সময় মংলুর ছোট বোন উসকির স্বামী, চাটানকে আসতে দেখা গেল খুঁটির দিক থেকে। এঁকে বেঁকে সাপের মতো আসছে যেন। যদিও হেঁটেই আসছে।

চৌকিদার ভোঁঞ্জ বলল, ওই যে আসছে নবাব। যাই বল, জীবনটা বেশ কাটিয়ে দিল তোমার ভগ্নিপোত। কারও পরোয়াই করল না। কী বল মংলু?

পুরো জীবনটা এখনও কাটেনি। পুরোটাই বেশ কাটায়, না তার জীবনের ধারে নিজেরই কেটে যায়, দেখা যে বাকি আছে এখনও।

ফুলমণি বলল।

মংলু বলল, চাটানটা অমন সাপের মতো এঁকে বেঁকে হাঁটে কেন বল তো?

অন্যরা হেসে উঠল ওর কথায়।

ইচ্ছে হলেই খোলস ছাড়া যায় যে! ছেলে চালাক আছে খুব।

ডুইক্যা বলল।

মংলুর মনটা খারাপ হয়ে গেল ছোট বোন উসকির কথা ভেবে। বোনটা আজকাল তাজনা শেল্যাক্‌ কোম্পানিতে কাজ করে। বোন কাজ করে আর ভগ্নিপোত গান গেয়ে গেয়ে, নেশা করে, এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। দশটা গাঁয়ের লোকের তাচ্ছিল্যের পাত্র সে। আবার ভয়ের পাত্রও বটে। ও করতে পারে না এমন কাজ নেই। কিন্তু কিছুই করে না।

চাটান কাছে এসে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে একটি ভঙ্গি করে বোঝাল যে, সেও হাঁড়িয়া চায়। বসতে চায়; হাঁড়িয়া খেতে চায়।

ওকে সকলে ঠেলে ঠুলে বসে শাল কাঠের বেঞ্চে জায়গা করে দিল। কেউ কেউ জমিতেও বসেছিল দু'পা দুদিকে ছড়িয়ে।

ফুলমণি হেসে বলল, যে না চায়, তাকেও আমরা দিই। বস বস। তা চললেটা কোথায় চাটান? শ্বশুরঘর?

চাটানের মুখ চোখে এমন এক স্নিগ্ধ পবিত্র ভাব আছে যে শত নেশাগ্রস্ততাতেও সেই মুখ কখনও কুটিল বা নিষ্ঠুর বা কামুক ভাবের হয়ে ওঠে না। তাই ও বেকার হলেও মেয়ে-মরদ সকলেই ওকে পছন্দ করে। মেয়েরা তো বিশেষই করে। মেয়েদের পছন্দ-অপছন্দের কথা জানা অবশ্য ভারি মুশকিল। ডুইক্যা ভাবে। দুঃখের কথা চাটান-এর বউ উসকির সঙ্গেই চাটান-এর কোনোদিন বনল না।

মুখে মুখে গান লেখে চাটান আর হেঁয়ালি হেঁয়ালি কথা বলে। এমন সব কথা, যে কথা এই অঞ্চলের দিন-আনা দিন-খাওয়া মানুষগুলোর মনে নানা রঙের ফুলঝুরি ফোটায়। তাদের নিস্তরঙ্গ জীবনে আবর্ত তোলে। চাটান তাদের হাসায়, আশা দেয় নানারকমের। চাটানকে একবার কাছে পেলে তাই কেউই ছাড়তে চায় না। আর উসকি সেসব শুনে বলে, ও তো একটা ভাঁড়। বিদূষক! ওর মতো ছ্যাবলা, বেশি-কথা-বলা, সকলের সঙ্গে মেশা মানুষ; আমি কোনোদিনও বিয়ে করতে চাইনি।

উসকির বড় ভাই মংলুকে দেখতে পেয়েই প্রণাম করে চাটান। সবসময়ই কী যেন এক ঘোরের মধ্যে থাকে মানুষটা। তাই ও কখনওই ওর চারধারে বা অন্যদের দিকে নজর রাখে না। নিজের মধ্যেই কাকে যেন ও খুঁজে বেড়ায় সব সময়। সেই "তাকে" যে সে নিজে পরিষ্কার করে চেনে এমনও নয়। চিনবেই যদি, তাহলে আর এতবার এতরকম করে খোঁজা কেন? বার বার হারানোই বা কেন? চাটান-এঁর বুকের মধ্যের কথাগুলির টানাপোড়েন চাটানই শুধু জানে। তবে লোকটার ঝগড়া নেই কারও সঙ্গেই। নিন্দামন্দ, অপমান,

অসম্মান, এমনকি প্রশংসাও চাটানকে ছুঁতে পারে না। চাটান বড় ভালোবাসে তার দেশ এই ছোটানাগাপুরাকে। যখনি এ অঞ্চলের কোনো গাঁয়ের কোনো মেয়ে বিয়ে করে দূরের বড় গঞ্জে বা শহরে চলে যায় ভালো থাকবে, ভালো খাবে বলে, তা জানতে পেলে তখনই চাটান স্বগতোক্তির মতো গান গায় তার সুরেলা গলায়;

"হাতুগো লিদিলিদিরে
হাতুগোম্ বাগেজাদা
দিশুমগো লায়া কোয়ারে
দিশুমগো রারা জাদা।"

মানেটা হল, সুন্দর এই গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছিস মেয়ে; এই গ্রাম, এত সুন্দর দিশুম, তুই আর কোথায় পাবি?

"মোদেকিয়া সিন্দূরীতে
হাতুগোম বাগেজাদা
বারে থারি সাসান্‌তে
দিশুম্‌গো রারা জাদা।"

মানে, এক-ভাগা সিঁদুর আর দু-ভাগা হলুদের জন্যে, যা তোর বর তোকে পরাবে, তারই জন্যে তুই এই সুন্দর গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছিস?

চাটান-এর চোখে সবই সুন্দর, গ্রাম সুন্দর, গ্রামের গাছপালা, মেয়ে-মরদ সব। মুখে যদিও বলে অনেকই কথা। সেদিন যেমন সিরকা মুণ্ডাকে বলল। তার সহবত-এও কোনো খুঁত নেই। যে-মানুষের পয়সা নেই, চাল নেই, চুলো নেই, সেই মানুষের সহবত যে মস্ত বড় মূলধন। আবার সহবতই যার নেই, তার পয়সা বা চাল-চুলো থেকেও কিছুমাত্র নেই।

উসকি কেমন আছে?

ফিসফিস করে শুধোল মংলু চাটানকে। চাটান-এর সঙ্গে উসকির সম্পর্ক যে স্বাভাবিক নয় তা এই অঞ্চলের সকলেই জানে। এরা

দুজনেই পাগল। কখনও কখনও সেই পাগলামি জোরদার হয়। তখন গ্রামের লোকেদেরও সমূহ বিপদ। তবে এর পাগলামির ধরনটা অন্য। চাটান অন্যরকম। ভাবুক, কবি, স্বপ্ন-দেখা মানুষ। আগুনের উপর হেঁটে গেলেও তার পা পোড়ে না অথচ কখনও কখনও তুলোর উপর পা রাখলেও কাঁটা ফোটে। ভোরের মিষ্টি বাতাসেও তার গায়ে ফোস্কা পড়ে!

চাটান বলল, ভালো। বলল, অন্যমনস্কভাবে।

আসে না কেন? টাংলাটোলিতে?

মংলু শুধোল।

জানি না। জিগ্যেস করব। তোমরাও দেখা হলে জিগগেস করতে পার।

তোমার সঙ্গে দেখা হয় না কি? রাতেও?

মংলু মুণ্ডা একটু অবাক হয়েই বলল। ভাবল, এ কেমন স্বামী-স্ত্রী!

হয় না, আবার হয়ও। তবে কথা কখনওই হয় না।

কেন?

আমাকে ও চলে যেতে বলেছিল ঘর ছেড়ে। চলেও এসেছি তাই।

সে কি? কবে?

এইতো ক'দিন হল।

তা এখন থাকছ কোথায়?

মাঠে ঘাটে। হাটের চালাঘরের নীচে।

তোমাকে ও ভালোবাসে।

মংলু বলল, দাদাসুলভ গাম্ভীর্য দেখিয়ে।

চাটান বলল, সে নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকেই কোনোদিন ভালোবাসেনি। নিজেকে, নিজের ঘরকে, নিজের ফুলগাছকে, নিজের গোরুকে। আমার চেয়ে, তার দেওয়ালে টাঙানো আয়নাটার দাম অনেকই বেশি ছিল চিরদিনই তার কাছে।

তুমি কী খাও?

খাই না। মা মরার পর থেকে খাওয়া-দাওয়া চুকে গেছে।

ভোঁঞ্জ বলল, বউ বলল চলে যেতে, আর তুমি বাড়ি ছেড়ে, চলে এলে! বউকেই তাড়ালে না কেন? বাড়ি তো তোমার!

চাটান কী একটু ভাবল। তারপর হেসে বলল, ও ওর বাড়ি ঘরকে খুবই ভালোবাসে। ওর খুবই দুঃখ হত ও বাড়ি ছাড়তে। তাছাড়া ও বলে, আমি তো মরদই নই।

কথাটা বলেছে বলে, চাটান লজ্জিত হল।

ফুলমণি আর বুদনি খিলখিল করে হেসে উঠল চাটানের কথা শুনে।

বলল, অন্য মেয়েরাও কি তাই বলে?

অন্য মেয়েদের কথা হচ্ছে না। উসকি আমাকে মরদ বলে মনে করে না। নি-মরদ বলে।

এবারে ফিচকে শেয়ালের মতো ফ্যাসস্ শব্দ করে ভোঁঞ্জ হেসে উঠল। বলল, তুমি মেনে নিলে এই বে-ইজ্জতি? তারপরও আর বেঁচে থেকে লাভ কী?

প্রমাণ দেবার সুযোগই তো পেলাম না। মরদ না নি-মরদ। প্রমাণটা তো তাকেই দিতে হবে। অন্যকে দিয়ে লাভ কী?

নিরুপায় হয়ে চাটান বলল।

এবারে চাটানের কথাতে সকলেই হো হো করে হেসে উঠল।

বিরক্ত ও বিড়ম্বিত মংলু তাড়াতাড়ি বলল, তা এসব কি হাটে বসে আলোচনা করার বিষয় চাটান?

যার ঘরই নাই, হাটই তো তার ঘর। হাটে আর ঘরে তার তফাতটা কী?

তা কথাটা তো সত্যিই যে উসকির কোলে ছেলে এল না এতদিনেও। বছর পাঁচেক তো বটেই!

ফুলমণি বলল।

তা আমি কী করব! দোষ আমার নয়। বিশ্বাস না হয় তো ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করাও।

চাটান বলল মুখ নিচু করে।

ঠিক সেই সময়ই বুডজুর মিশান থেকে ধুলো উড়িয়ে গাড়ি এল একটা। গাড়িটা মোড়ে থামল। গোমেজ নামল। ধুলো-উড়িয়ে মিশানের গাড়ি খুঁটির দিকে চলে গেল। সাদা মারুতি জিপসি একটা। বুড্‌জুর মিশান, জার্মান মিশান। লুথেরান। এসব অঞ্চল তো একসময় পরম পণ্ডিত জার্মান ফাদার হফ্‌ফ্‌ম্যানেরই এলাকা ছিল।

ভোঁঞ্জ বলল, কী গোমেজ? হবে নাকি একটু?

রতনলালের বাস ধরতে হবে। হাতে সময় নেই।

পুরো তৈরি-হয়ে যাওয়া চৌকিদার ভোঁঞ্জ বলল, যার হাতে এক দোনা হাঁড়িয়া গেলার সময়ও নেই তার হাতে সব থেকেও কিছুই নেই। তার বাঁচারও কোনো মানেই নেই। এ দুনিয়াতে সময় হচ্ছে সবচেয়ে দামি। বুঝলে গোমেজ। এস এস। বস। দাও তো ফুলমণি! ওর দু'হাত ভরে শাল দোনা দাও।

কতক্ষণ বসেছ চৌকিদার সাহেব?

তা-আ-আ অনেকক্ষণ! ঘড়ি তো দেখিনি। এই ভারতবর্ষের একটা টুকরোর ভার আমার উপরে। বুঝেছ গোমেজ। বুঝলে কি? মাথার উপরে সিঙবোঙা, তার নীচে রাজীব গান্ধি আর তারই ঠিক নীচে আমি। আমার দায়িত্ব-কর্তব্য নিয়ে ঠাট্টা কোরো না কখনও। আমি বলেই এই গুরুভার বয়েও এখনও বেঁচে আছি।

চৌকিদার সাহেব, তুমি সাইকেল চালিয়ে যেতে পারবে তো থানায়?

ডুইক্যা শুধোলো।

আজ থানায় আর যাব না। গেলে, কেলো করব। দারোগাটা তো একটা হারামজাদা।

তবে? এখন আর যাবে কোথায়? বাড়িতে?

বাড়িতে তো যেতে হবেই। মংলু বলল। পারবে তো? সাইকেল চালিয়ে?

তা পারব। মানে, পারতে হবেই। বাঘ কি গুহায় না ফিরে পারে?

তবু একবার টেরাই নিয়ে দেখলে পারতে চৌকিদার সাহেব। কোথায় এই আগুন-দুপুরে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে পথের উপরে মোরগা লড়াই-এর ছুরি-খাওয়া মোরগার মতো। সেটা কি ভালো হবে?

ভোঁঞ্জ বলল, কথাটা মন্দ বলেনি ডুইক্যা। একটু টেরাই দিয়ে দেখলে হয়। বলেই, খাকি প্যান্টের উপরের কোমরের বেল্টটাকে একবার টাইট করে বেঁধে নিয়ে এক-ঝটকাতে সাইকেলে উঠতে গিয়েই ধাঁই করে পড়ল ওদের সামনেই। সাইকেলের বেলটা ঝনঝনিয়ে উঠল। প্যান্টের বেল্টটা খুলে গেল।

সকলেই হো হো করে হেসে উঠল। চৌকিদার ভোঁঞ্জ নিজেও।

ডুইক্যার ভালো লাগল ব্যাপারটা। যে নিজেকে নিয়ে নিজে রসিকতা করতে পারে না, সে পুরোপুরি মানুষই হয়নি।

ডুইক্যা বলল, এখন হাসছ চৌকিদার সাহেব। বাড়ি গেলে দেবে তোমাকে মুণ্ডাইন।

যা বলেছ। সেই তো হল আমার জমাদার সাহেব। সত্যিই ভয় পাও আর না পাও, বউকে যে ভয় পাও, সেটা দেখানো ভালো। আমি তো স্রিফ্ চৌকিদারই! বৌকে ভয় পেও। সংসারে শান্তি থাকবে।

আর একটু দেব নাকি?

ফুলমণি বলল।

না, না। এবারে যেতে হবেই। দেখি, টেরাই করে আরেকবার।

বলেই, আরেক ঝট্‌কা-মেরে সাইকেলে চেপে বসল চৌকিদার সাহেব এবারে। গোল করে একটা চক্করও কাটল চাঁর গাছটাকে এবং শালের তক্তা এবং জমিতে বসে-থাকা সবাইকে ঘিরে। তারপর বাঁ হাত নেড়ে 'টা টা' করে দিল সবাইকে। তারপর সবাইকে সন্ত্রস্ত করে সাইকেলের প্যাডল চালু করল। হাঁড়িয়ার নেশায় বুঁদ হয়ে গান ধরল মুখে :

'এক দো তিন্ চার পাঁচ, ছয় সাত আট নয়
দস ইগারা বারা তেরা,
তেরা করু, দিন গিন্ গিন্‌কে, ইন্তেজার...।"

গান গাইতে গাইতে গানের সুরের সঙ্গে তার রেখে সাইকেলের হ্যান্ডেল ঘুরোতে ঘুরোতে খুঁটির দিকের পথে চলে গেল চৌকিদার ভোঁঞ্জ প্যান্ট-ছল্‌ছল্ সাইকেল-টল্‌টল্ করতে করতে।

চৌকিদার চলে গেলে, চললে কোথায় এই ভরদুপুরে?

মংলু শুধোল গোমেজকে।

আমাদের আবার ভরদুপুর কী! কাজ পড়লেই যেতে হয় আমাদের। এখান থেকে সোজা যাব চক্রধরপুর। ফেরবার সময় টেবোতে নেমে যাব। কাল সকালে টেবো থেকে বন্দ্‌গাঁওতে এসে তারপর ফিরব বিকেলের বাস ধরে মূরহুতে।

ডুইক্যা বলল, তোমরা তাও বেঁচে গেলে মিশান ছিল বলে। পেটে তো না খেয়ে মরবে না আর! এবারে যা অবস্থা, তাতে তো দেখছি ছেলে-মেয়ে, কাঁড়া-বয়েল বলদ-মুরগি নিয়ে সব না খেয়েই মরতে হবে। গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যাবে।

কেউই মরবে না। চাটান বলল।

খুব নেশা হয়েছে বুঝি! এত অল্পতেই?

ফুলমণি শুধোল।

না। নেশা হয়নি। খেত-জমিনে 'হারাম' আর কিছুই রাখেননি আমাদের জন্যে। তবে মরব না আমরা কেউই! বরং আমাদের সুদিন আসছে খুবই সুদিন।

সুদিন?

চারধারের হু-হু হাওয়া-বওয়া রুক্ষ শুকনো বৃক্ষহীন তৃণহীন প্রকৃতির সর্বনাশা চেহারার দিকে চেয়ে চাটান মুণ্ডার "সুদিন"-এর কথাতে আতঙ্কিত হল ওরা সকলেই।

পশ্চিমের মাহাড়াওড়া পাহাড়, পুলের গাড়িকোদুরাংবুড়ু পাহাড়, এদের সকলকেই যেন কেমন রোঁয়া-ওঠা তির-খাওয়া মৃত-প্রায় থেবড়ে-বসা রোমহীন মাদি-শম্বরের মতো দেখাচ্ছে। তাই এরই মধ্যে চাটান্-এর মুখ-নিঃসৃত "সুদিন" কথাটা বড়ই ঠাট্টার মতো শোনাল। গাছে গাছে এখন "মায়না", "সুগা", "সাল্লু-মায়না", "রিচ্চি", "টোঁয়সা", "তোয়াও" সব পাখিরাই শুকনো-ঠোঁটে পাতার আড়ালে ধুক্‌পুক্-বুকে বসে আছে। ওদের সরু সরু গলার শিরাগুলো উঠছে-নামছে। গাছের নীচে পুটুসের ঝাড়ের মধ্যে অন্ধকার খুঁজে অতি বাচাল টেঁচুয়া পাখিরাও স্তব্ধ হয়ে আছে। ওদের ছাই-রঙা পিঠ আর হালকা ছাইরঙা বুকে ভয় লেগেছে। গ্রীষ্মের ভয়। খরার ভয়।

ডুইক্যা মুণ্ডা দু'হাতে ধরে দোনাটা গলার মধ্যে ঢেলে দিয়ে পায়ের কাছে দোনাটা ফেলে রাগের স্বর করে বলল, কীসের সুদিন?

মংলু, ডুইক্যার এই রাগের দিকে চেয়ে রইল। ভালো হোক, মন্দ হোক, চাটান তো তার ভগ্নিপতি। এখনও।

চাটান তার ছাই-রঙা দেহাতি খদ্দরের মোটা এবং ছেঁড়া জামাটার ডান পকেটে হাত চালিয়ে এক মুঠো ধুলো বের করল। বের করে, যারা সেখানে ছিল, তাদের প্রত্যেকের হাতের তেলোতে একটু একটু করে ঢেলে দিল।

সকলেই হাতের তেলো খুলে অবাক হয়ে গেল। ধুলোর মধ্যে সোনার কুচি। ঝিক্‌মিক্ করছে।

কী হল? কেমন হল? কোথায় পেলে চাটান?

সক্কলে চাটান্‌কে ঘিরে ধরল।

ওই গরমে তার মুখের কাছে ঝুঁকে-পড়া ভিড়ে ভিড়ে চাটান-এর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল।

কে দিল? বল চাটান?

গোমেজ বলল।

উত্তেজিত গলায় বলল চাটান, আমাদের "গোমকে" দিয়েছেন। সিঙবোঙা। তোদের জিশু দেয়নি।

এসব কী খারাপ কথা!

ডুইক্যা মুণ্ডা বলল।

যে জিশু, সেই তো হারাম্। তাহলে এসব ফালতু কথা বলা কেন?

বেশ! তাই! ফিরিয়ে নিলাম কথা।

ফুলমণি বলল, এবার সত্যি করে বল তো চাটান কে দিয়েছে? কে রে? নদী? তাজনা?

চাটান বলল, ফুলমণিকে, একটু খৈনি দে।

ফুলমণি বলল, হুঁকো খাবি?

দুস্‌স্। হুঁকো তো মেয়েরা খায়।

মংলু ট্যাঁক থেকে খুলে একটু খৈনি দিল চাটানকে।

তামাকটা মুখে পুরে চাটান বলল, নদী দেয়নি।

তাজনা নয় তো অন্য নদী? সঞ্জয়?

না। নদী দেয়নি।

তবে? পাহাড়?

মাথা নোয়াল চাটান।

কোন পাহাড়? বলতে হবে।

বলব না।

বলবি না?

না।

বলেই, চাটান উঠে দাঁড়াল।

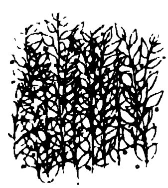
তারপর মুখ ঘুরিয়ে বলল, সব পাহাড়ে খোঁজ তোরা। সব পাহাড়তলিতে খোঁজ। তাজনা নদীতে খোঁজ। ঝির্‌পানিতে খোঁজ। সঞ্জয়তে খোঁজ। বান্দে, সুরুন্দা, গৌড়াটুলী, ঢুরুরী, যাণ্ডেবিন্দা, কুর্‌কি, সিয়াংকেল্‌, লদামকেল, গুলু, কুলুডা, হেসাডি, ডোম্বারি, বাণ্ডি, কুন্দ্রূবুটু টেবো সব জায়গায় খোঁজ লাগা। নয়ত..

ওরা সমস্বরে বলল, নয়ত?

নয়ত আমাকে বোঙাজ্ঞানে পুজো কর। পুজোতে খুশি হলে বাতলে দেবো তোদের কাউকে। হিঃ হিঃ।

মন্ত্রমুগ্ধ, চিন্তিত, লোভাতুর অতজন মেয়ে-মরদকে, তার মধ্যে তার স্ত্রীর দাদা মংলুও ছিল; দলবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে রেখে চাটান ওই রৌদ্রদগ্ধ দুপুরে নিজের মনে গান গাইতে গাইতে আস্তে আস্তে পা ফেলে ফেলে মিলিয়ে যেতে লাগল দূরের খুঁটির পথে।

চাটানই জানে, চাটান কোথায় যাবে; কোথায় রাত কাটাবে।



আজ মুঙ্গরীর মনটা ভালো নেই। মাঝে মাঝেই ওর এরকম হয়। তখন কিছুই আর ভালো লাগে না। নিজেকে নিজেই শুধোয়, কেন এসেছিল এ পৃথিবীতে? কি করার ছিল কাজ? সে কাজ যে কী, যখন তা জানবে এবং তা করা শেষ হয়েও যাবে তখনও এখানে থেকে কী হবে?

তার আজ্জা সিরকা মুণ্ডা দাওয়াতে বসে বিড়ি খাচ্ছিল। এখন বাড়িতে কেউই নেই। সবাই গেছে গাঁয়ের এক বাড়িতে চাট্টিকিয়ার নেমন্তন্ন খেতে। ওদের এই বাচ্চা হওয়ার পর চাট্টিকিয়ার নেমন্তন্ন বা কারও মৃত্যু হলে তার ছায়া বাড়িতে নিয়ে আসা এসব কিছুরই মানে বুঝতে পারে না মুঙ্গরী। কোনোদিন কেউ তাকে বুঝিয়ে বলেওনি। ভাব দেখে মনে হয়, সকলেই সব জানে। পুতুলের মতো এইসব নিয়ম-প্রথা, রীতি-নীতি মেনে যায়। অথচ মুঙ্গরীর সন্দেহ আছে যে, অনেকেই সত্যিই এসবের মানে জানে না। আসলে, অনেকেরই মনে এইসব প্রশ্নই জাগে না। সব কিছুকেই তারা মেনে নেয়, গভীরে গিয়ে এইসব রীতি-নীতি উৎসব-অনুষ্ঠানের মূলে যে কি আছে তা জানতেও চায় না। গ্রহণযোগ্য কি না এসব, তাও ভেবে দেখে না। যুগ-যুগ ধরে করে আসছে বাবা-মা-দিদিমা, তাই করে।

মুঙ্গরী শুধোল, আজ্জা, চাট্টি কেন করে বাচ্চা হওয়ার পর? কেউ মরে গেলেও-বা তার ছায়াকে কেন বাড়িতে বয়ে নিয়ে এসে রাখে?

সিরকা মুণ্ডা, নাতনিকে কাছে ডেকে বলল, আয়। আমার কাছে এসে বোস।

এদের বাড়ির পেছনের শিমুল গাছটাতে নতুন পাতা এসেছে। ফুল ঝরে গেছে সব কবে। তার সটান চেহারার পাতা-ভরা শরীরে চাঁদের আলো পিছলে যাচ্ছে। পাখি ডাকছে চন্দ্রালোকিত টাঁড়ের এদিক ওদিক থেকে। এই রাতপাখিরা দিনে কোথায় থাকে, কে জানে!

সিরকা বলল, আমাদের এই জীবন দুদিনের। "নে জনম্ বার্‌সিং নাগেন্"। মৃত্যুর পরই শরীরে পচন ধরতে শুরু করে। কয়েক ঘণ্টা পরেই "সাসান"-এ নিয়ে গিয়ে সেই দেহ পুঁতে দেওয়া হয়। আগুন জ্বালিয়ে, মন্ত্র পড়ে, তাকে কবরে শুইয়ে দেওয়া হয়। সে চলে যায় কিন্তু তার আত্মা, "জি" থেকে যায়। 'রোয়া' থেকে যায়; যার মৃত্যু নেই। আগুনের পর্দা ভেদ করতে হয় মুণ্ডাদের প্রতি পদে। জন্মের পর, মুণ্ডা হয়ে ওঠার সময়ে; বিয়ের সময়, মৃত্যুর পরে ওই আগুনের পর্দা পেরিয়ে অদৃশ্যলোকে চলে যাবার সময়ও। মৃতকে "সাসানডিরি"তে শুইয়ে রেখে তার ছায়া নিয়ে আসি আমরা। তারই বাড়ির পাশে ছোট্ট চালাঘর বানিয়ে তাকে আমরা থাকতে দিই। মানে, তার ছায়াকে। তারপর সেই চালাতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তাকে তার নাম ধরে তিনবার ডেকে বলি, "পালাও! পালাও! তোমার ঘরে আগুন লেগেছে।"

'রোয়া'রও যেন শরীর আছে এমনভাবেই আমরা দেখি তাকে। মনে করি, তার খিদে আছে, তৃষ্ণা আছে, তাই তাকে খাবার দিই, জল দিই, হাঁড়িয়া দিই। ছায়াকে নিয়ে আসার পর বাড়ি ফিরে তার খাবার ও জল যাতে মজুত থাকে তা দেখি আমরা। এই ছায়া, "উম্বুল", তার পর থেকে সেই পরিবারেই একজন হয়ে থেকে যায়। "বোঙ্গা" হয়ে যায় সে। "ওরা-বোঙ্গা"। তাকে, মানে, তার আত্মাকে, আমরা আছে বলে অনুভব করতে পারি কিন্তু চোখে দেখতে পাই না। উৎসবে অনুষ্ঠানে তাকে আমরা ভুলি না। তাকেও জল দিই, খাবার দিই। হাঁড়িয়া দিই।

মুঙ্গরী বলল, আজ্জা, আগে আমাকে চাট্টির কথা বল। জন্মের পরে কেন চাট্টি করতে হয়?

ও।

বলেই, সিরকা বলল, হারাম যে আমাদের শিশু দেন এবং মানুষেরই শিশু সে তো হারামেরই দয়া।

মানুষের শিশু মানে? মানুষের বাচ্চা তো মানুষের বাচ্চাই হবে।

কে বলতে পারে রে দিদি! জন্মের আগে তো আমরা বলতে পারি না যে মেয়ে, ছোট্ট লিক্‌লিকে একটি সাপ না ডেকরা-ডোরা বাঘের বাচ্চার জন্ম দেবে! তাই মানুষের মেয়ে শিশু প্রসব করলেই আমরা খুশি হই। কিন্তু শিশু জন্মানো মাত্রই মুণ্ডা সমাজের একজন কিন্তু সে হয়ে ওঠে না। জন্মের ন'দিন পরে, চান্দ্রমাসের হিসেবে চাট্টি উৎসব করি আমরা। যে-মাদুরে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছিল তাও পুড়িয়ে দিই। সকলে নখ কাটি। চাট্টি উৎসবে শুধু শিশুকেই যে পবিত্র করে নেওয়া হয় তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে তার মাকেও পবিত্র করা হয়। দুজনকেই মুণ্ডা সমাজ গ্রহণ করে। মাকে নতুন করে; শিশুকে প্রথমবার।

আমাদের সব অনুষ্ঠানেই আগুন জ্বালাই কেন আমরা আজ্জা?

এই আগুনের বৃষ্টি দিয়ে, আগুনের আড়াল সৃষ্টি করেই তো হাসুরদের ধ্বংস করে, পৃথিবীকে ধ্বংস করে হারাম আমাদের চোখের আড়ালে চলে গিয়েছিলেন। তারপর থেকেই তো তাঁকে আমরা চোখে দেখতে পাই না। আগুনের বৃষ্টি ঝরিয়ে সেই যে হারাম আড়ালে চলে গেলেন, "ডানাঙ্গএন্‌জানে", মানে, "লুকিয়ে ফেললেন নিজেকে", সেই থেকেই তো তিনি অদৃশ্য। আগুনের পর্দা টাঙিয়ে দিয়ে চ'লে গেলেন বলেই আমাদের জন্ম-মৃত্যুতে আগুনের এত বড় ভূমিকা! আমাদের তো চোখ নেই, কান নেই, হারামই তো আমাদের সব! তিনি শোনালেই শুনি; তিনি দেখালেই দেখি। যে-জগৎকে জীবিতাবস্থায় আমরা চোখ দিয়ে দেখতে পাই সেই জগৎই মৃত্যুর

পরের অদৃশ্য জগতের প্রতিরূপ। চাট্টির সময়ে আমরা বলি : "প্রভু! আমরা তো ভয় পেয়েছিলাম, মানুষের শিশু আদৌ ভূমিষ্ঠ হবে কি-না! তোমার দয়ায়, তাই আমরা আনন্দিত।"

যখন কাউকে সাসান্‌ডিহিতে কবর দিই আমরা তখনও বলি যে : "আমি তোমাকে জানাচ্ছি প্রভু যে, এই নামের এই মানুষ, আমাদের বাবা বা মা, ভাই বা বোন, আমাদের ছেড়ে চলে গেল। সে আজ থেকে আমাদের সমাজের বাইরে চলে গেল।" বলি : "হে প্রভু, তুমি আমাদের আত্মাকে শুদ্ধ কর, মৃতের আত্মাকে শুদ্ধ কর; নদী গঙ্গার জলের মতো পবিত্র কর। আমাদের সকলকে তোমার হাতে তুলে নাও। বুকের কাছে রাখ।" আমাদের শেষ যাত্রায় আমরা যখন কবরে শুয়ে থাকি, দক্ষিণে মাথা রেখে আর উত্তরে পা; তখন আমাদের ছায়া দিও তুমি, আশ্রয় দিও। তোমারই গাছের তলায়, তোমার শাখা-প্রশাখার ছায়ায় আবার কোনোদিন যেন আমরা আমাদের চলে-যাওয়া প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হতে পারি। একত্রিত হতে পারি।

আমরা কেঁদে কেঁদে বলি, চলে-যাওয়া জনের উদ্দেশে : "তুমি তোমার থাকার যোগ্য কোনো ঘর আর পেলে না আমাদের বাড়িতে। তুমি আর আমাদের সঙ্গে থাকতে চাইলে না। ও আমার সোনা, তুমি অন্য ঘর বানিয়ে চলে গেলে! তোমার নতুন ঘরের চাল কেমন? তা ঢালু না সমান? ও বাবা (বা মা, কী দাদা বা বোন) তোমায় কোথায় আবার দেখতে পাব আমরা? তুমি যে লুকিয়ে ফেললে তোমাকে, হায়! হায়! সোনামণি আমার।

এই যে আত্মার নিজেকে লুকিয়ে ফেলা এর সঙ্গে আগুন বৃষ্টির পর আগুনের ঝালরের আড়ালে হারাম-এর লুকিয়ে ফেলার মিল আছে অনেক। হারাম যেমন অভিমানে, হাসুরদের লোভ ও দুর্বিনয়ে অপমানিত হয়ে লুকিয়ে ফেলেছিলেন নিজেকে, আমাদের প্রিয়জনেরাও মৃত্যুর পর তেমনি লুকিয়ে ফেলে নিজেদের। জীবন

তো হারাম-এরই দান! তিনি তো পরম-প্রভু! তিনিই এই বিশ্বসংসারের নিয়ন্তা, সূর্য ও চাঁদের জন্মদাতা; তিনিই সব। আমাদের নিজেদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাতে কিছুমাত্রই হয় না। হবে না। হারাম-এর ইচ্ছা পূর্ণ করাই আমাদের একমাত্র কাজ। আমরা যদি লোভী হয়ে যাই, উদ্ধত হয়ে যাই, যদি আমরা তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছার দাম না দিই তবে আমাদের অবস্থাও একদিন ওই হাসুরদের মতোই হবে; সেই কামারদের মতো। আকাশ ঝেঁপে আগুনের বৃষ্টি নামবে, আমাদের অন্ধ করে; আমরা সকলে, গাছ-পালা-পাখি-প্রজাপতি সব প্রাণীই আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাব।

হারাম-এর অভিশাপ কখন পড়ে আমাদের উপরে? আজ্জা?

মুঙ্গরী শুধোল।

সিরকা মুণ্ডা বলল, দাঁড়া রে! একটা বিড়ি ধরিয়ে নিই।

বিড়ি ধরিয়ে, বিড়িতে টান দিয়ে, ধোঁয়া ছেড়ে সিরকা বলল, হারাম, মানুষদেরই একমাত্র বুদ্ধি দিয়েছেন, অগণ্য প্রাণীদের মধ্যে। কিন্তু বুদ্ধি দিয়েছেন বলেই একমাত্র মানুষই পারে তার নিজের বুদ্ধিতে কুপথে যেতে। হাসুরদেরও তো (কামারদের) হারাম বুদ্ধি দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা সেই বুদ্ধিকে দুর্বুদ্ধি করে তুলেছিল। হারাম রাতের বেলা মানুষদের বিশ্রাম নেবার জন্যে রাত তৈরি করেছিলেন কিন্তু তারা দিন-রাত হাপর চালিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র বানাত। মানুষে-মানুষে হানাহানির হাতিয়ার। হারাম লাঙল দিয়ে চাষ করার জন্যে লাঙল দিয়েছিলেন আমাদের কিন্তু হাসুররা হারাম-এর নির্দেশ না মেনে লৌহ-আকর গলিয়ে তা থেকে লোহা তৈরি করে পৃথিবীর পরিবেশ দূষিত করে তুলেছিল। হারাম যা করতে বলেছিলেন, তারা তার ঠিক উল্টোটাই করেছিল। হাপরের গরমে গাছ মরে গেছিল, পুকুর শুকিয়ে গেছিল, মানুষ-প্রাণী সকলেরই নাভিশ্বাস উঠেছিল। অসুরদের এই পার্থিব প্রার্থনার একটি নৈতিক দিকও অবশ্যই ছিল।

তারা উদ্ধত, লোভী ও গর্বিত হয়ে উঠেছিল। পীড়িত মানুষদের সনির্বন্ধ অনুরোধে হারাম-এর পাঠানো দূতদেরও তারা অপমান করেছিল। তারা ভেবেছিল, তারাই পৃথিবীর মালিক হয়ে উঠেছে। হারাম-এর পরোয়া করাও প্রয়োজন মনে করেনি তারা। হারামকে তারা ভেবেছিল বুঝি শুধুমাত্র সূর্যেরই প্রতিভূ। অথবা দ্যোতক। এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে শুধুমাত্র সূর্যকেই তারা প্রয়োজনীয় মনে করে হারাম-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। তাদের জীবন অবিন্যস্ত হয়ে পড়েছিল। চরম বিশৃঙ্খলা আর লোভ আর দুর্বিনয়ের মধ্যে দিয়ে তারা তাদের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল।

হারাম তাই আমাদের দৃষ্টির সামনে থেকে সরে গিয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের চালক ও পালকের ভূমিকা ছেড়ে মানুষের চোখে কেবল "সিঙ-বোঙা" বা "সূর্য-দেবতা"ই হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু পৃথিবী সম্পর্কে তাঁর ধ্যান-ধারণা বা ভালোবাসা একটুও তিনি পালটাননি। পৃথিবীকে উদ্দেশ্যহীন করে তোলা তাঁর ইচ্ছা ছিল না। পৃথিবী মানুষের জন্যেই রইল। মানুষকে বেঁচে থাকতে দেবার জন্যে। হাসুররা যে অগ্নিকে একমাত্র উপাস্য বলে জেনেছিল, সেই তাদের অগ্নিবর্ষণেই ধ্বংস করে দিলেন হারাম। পৃথিবীকে ধ্বংস করেও আবার তিনিই মুণ্ডা জগৎকে বাঁচালেন। আমাদের সৃষ্টির ইতিহাসের প্রারম্ভে ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিল, তা থেকে তিনিই আমাদের উত্তরণ ঘটিয়েছিলেন, আলোতে এনেছিলেন। উত্তরণের পর আবারও অন্ধকার। আমাদের এই মুণ্ডা প্রজাতির মধ্যে এই উত্থান-পতন বারবারই ঘটেছে। হারাম থেকে যেই আমরা সরে এসেছি, তাঁকে অমান্য করেছি, অশ্রদ্ধা করেছি, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করিনি; অমনি সর্বনাশ হয়েছে আমাদের।

মুঙ্গরী বলল, আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আজ্জা, এখনও কি আমরা আবারও সর্বনাশের দিকে এগোচ্ছি?

এগোচ্ছি। এগোচ্ছি। তাইতো ভয়ে সিঁটিয়ে থাকি সবসময়ে। আমার কি? আমার দিন তো সাসানডিরিতে এসে থেমেই যাবে আর ক'দিন বাদে। যে-লোভ, যে-বিশৃঙ্খলা, নিজেদের মূল্যবোধের প্রতি যে অশ্রদ্ধা চারদিকে দেখছি তাতে চিন্তা হয় তোদেরই জন্যে রে মুঙ্গরী। বড়ই চিন্তা হয়। আগুনই আমাদের সুখ-দুঃখের প্রতীক। এই আগুনেই আমাদের সকলের শেষ সর্বনাশ হবে। নিজেরাই নিজেদের প্রতিনিয়ত অপমান করছি। মানুষের মূল্যবোধ ও মনুষ্যত্বের অপমানেই তো হারাম-এরও অপমান!

চাটান মুণ্ডা যে সোনা পেয়েছে তা কি তার নেওয়া উচিত?

মুঙ্গরী শুধোল।

কক্ষনোওই না। সোনাও তো লৌহ-আকরেরই মতো! আমরা যদি গাছ না কাটতাম, অনাচার না করতাম, জঙ্গলকে বাঁচিয়ে রাখতাম তবে এই খরা আদৌ আসত না। হারাম আমাদের কী দেননি বল? লোভ একটু কম থাকলে, 'দিকু'দের দেখাদেখি নিজেদের নিজস্বতা না ছাড়লে আমাদের কোন্ ক্ষতিটা হত? সেদিন এই ন্যাড়া দিশুম-এ হাতি এসে হাজির হল। হাতির থাকার জায়গা হবে কোথায়? যেখানে খরগোশের লুকোবার জায়গা নেই। প্রথম দিন থেকেই তেমন জোর করলে আজকে এই সাবা দিশুম এমন সাসানডিরি হয়ে উঠত না। আমার বড় ভয় করে রে মুঙ্গরী। এই পুরো "সোনারুপান্ রুপালেকান্ ছোটানাগাপুরা" বোধহয় একদিন 'সাসান্ডিরি'ই হয়ে যাবে। হু হু করে মরুভূমির মতো গরম হাওয়া বইবে তার উপর দিয়ে, ঝরাপাতা উড়বে মচ্মচ্ করে, কবরের মধ্যে শুয়ে থাকা, পাথরের ফলকের চিহ্নে-চিহ্নিত আমাদের পূর্ব-পুরুষদের "রোয়া"রা ভয়ে, রাগে, দুঃখে, কেঁপে কেঁপে উঠবে। সে বড় দুর্দিন হবে রে মুঙ্গরী। বড়ই দুর্দিন!

মুঙ্গরীর আজ্জি, মা, জেঠিমা সকলে ফিরে এল। মুঙ্গরীর আর সিরকার জন্যে খাবার আর হাঁড়িয়াও নিয়ে। সিরকা বলল, আমি কিছু খাব না আজ। শরীর ভালো নেই।

সিরকা একা দাওয়াতে বসেছিল। ইন্‌-কা-বিন্‌কা এসে বলল, আজ্জা, তুমি অনেকদিন গল্প বলোনি। গল্প বলো আমাদের।

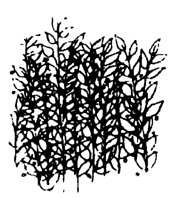
আজ চাঁদ উঠেছে। চাঁদের দিকে আঙুল দেখিয়ে সিরকা বলল, জানিস তো, তারারা সব চাঁদেরই ছেলেমেয়ে। এই ব্রহ্মাণ্ডে একটা সময় ছিল যখন আকাশময় দিনের বেলাতেও সব উজ্জ্বল তারাদের দেখা যেত। সেইসব উজ্জ্বল তারারা ছিল সূর্যেরই ছেলেমেয়ে। বুঝলি। একদিন চাঁদ সূর্যকে নেমন্তন্ন করেছিল তার বাড়িতে শশা দিয়ে বানানো স্বাদু ঝোল খেতে। সূর্যের সেই ঝোল খেয়ে খুবই ভালো লেগেছিল। জিজ্ঞেস করেছিল সূর্য, কী করে এই ঝোল বানায়? চাঁদ মিথ্যে কথা বলেছিল সূর্যকে। বলেছিল যে, সে তার ছেলেমেয়েদের মেরে তাদেরই সিদ্ধ করে ওই ঝোল বানিয়েছে। ছেলেমেয়েদের কিন্তু আসলে, চাঁদ লুকিয়েই রেখেছিল।

সূর্য চাঁদের এই কথা-না শুনে, বাড়ি গিয়ে নিজের ছেলেমেয়েদের মেরে সেদ্ধ করে খেয়ে নিল। আর সূর্যের ছেলেমেয়েরা যেই মরে গেল অমনি চাঁদ তার ছেলেমেয়েদের যারা রাতের আকাশে তারা হয়ে এখন ফোটে; তাদের বের করল এক এক করে।

যখনি চাঁদে বা সূর্যে আংশিক গ্রহণ লাগে তখনই বুঝতে হবে যে ঋণে জড়িয়ে গেছে তারা। কোনো বোঙার কাছে বা অনেক বোঙার কাছে ধার নিয়ে আর শুধতে পারেনি। চাঁদ অথবা সূর্য। যখন উত্তমর্ণরা চাঁদ সূর্যের চারপাশ ঘিরে সভা বসায় তখনই চাঁদ-সূর্যের চারপাশে উদ্ভাসিত আলোর বলয় দেখা যায়। দেখেছিস লক্ষ্য করে কখনও? ধার শুধতে না পারলে উত্তমর্ণ বোঙারা যখন চাঁদ বা সূর্যকে

কারাগারে পাঠান তখনই হয় পূর্ণগ্রহণ। সারা পৃথিবী তখন অন্ধকার হয়ে যায় চাঁদ সূর্যে গ্রহণ লাগাতে।

সিরকা পুতিদের মাথায় হাত রেখে ভাবছিল, তারা নিজেরা যখন ছোট ছিল তখন তাদের আজ্জা-আজ্জিরা কত গল্পই না তাদের শোনাত! এখনকার ছেলেমেয়েদের এসব শোনার বা জানার কোনো আগ্রহই নেই। আজ্জা-আজ্জিদেরও গল্প বলার সময় বা মন নেই। এখনকার ছেলেমেয়েরা হিন্দি সিনেমা দেখতে যায় দূরের শহরে, বাসে করে। টি ভি দেখে খুঁটি বা মূরহুতে গিয়ে। নিজেদের ইতিহাস, নিজেদের রূপকথা, নিজেদের ধর্ম-অধর্ম, বিশ্বাস-অবিশ্বাস সম্বন্ধে তাদের কারও কোনো ঔৎসুক্যই নেই আর। সিরকা মুণ্ডাদের প্রজন্মের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এত জানা, এত জ্ঞান, সবই চলে যাবে সাসান্‌ডিরির কবরের নীচে। সিরকা মুণ্ডার ছায়া হয়ে, "রা-বোঙ্গা"র সঙ্গেই থেকে যাবে। কিন্তু মানুষের 'জি' বা আত্মা যে ল্যাংড়া! চলা-ফেরাও তো তেমন করতে পারবে না তখন নিজে নিজে। এসব ভেবে আজকাল বড়ই একলা, বিষাদগ্রস্ত লাগে সিরকা মুণ্ডার। ওই পারে, যে-পারের দেখা যায় না কিছুই; সেই পারে কি আছে? কে জানে! একটু ভয় যে করে না আজকাল তাও নয়। ছেলে-বউ নাতি-নাতনি-পুতিদের মধ্যে থেকেও সবসময়ই বুঝতে পারে যে সে এই মূল-প্রবাহের কেউই নয়। এক পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে 'সাসান্‌ডিরি'তে।



●

তাজনা নদীর এই দিকটা বেশ নির্জন। তাজনা শেল্যাক ফ্যাক্টরির পরে নদীটা একটা বাঁক নিয়ে একটি মুণ্ডা গ্রামের পাশ দিয়ে এসে একেবারে ফাঁকাতে পড়েছে। এখানে নদী একেবারেই একা। কিছু ঝাঁটি-জঙ্গল আছে, কিছু পাখি, কাঠবিড়ালী; ক্বচিৎ-শেয়াল। মুণ্ডাদের গাঁয়ের কাছাকাছি শেয়ালদের থাকার সাহসও নেই। শেয়ালের চর্বি মুণ্ডারা নানা ওষুধের কাজে লাগায় তো!

চাটান বলেছিল মুঙ্গরীকে, কারখানাতে না গিয়ে এখানেই আসতে। সে আজ এদিকে গাছ লাগাবে সারাদিন। সেইটাই ভুল করেছিল মুঙ্গরী। 'শোনেঘর' থেকে রাতে, বিশেষ কোনো উৎসবের রাতে চলে এলে এবং শেষ রাতে ফিরে গেলে কারও চোখে পড়ে না। কিন্তু কারখানায় না-গেলে চোখে পড়ে সকলেরই। সবচেয়ে বড় কথা, নিজের বাবা যে কারখানাতে কাজ করে, সেই কারখানায় না গেলে তো সকলের চোখে পড়ারই কথা। দিনের রুজিও মারা যায়। আর রুজি নিয়ে রসিকতা করার মতো অবস্থা তো মুঙ্গরীদের নয়!

তবুও এসেছিল। কারণ চাটান-এর কথা অমান্য করে, এমন জোর মুঙ্গরীর নেই। আরও নেই, কারণ যেদিন সাসানডিরিতে আজ্জার সঙ্গে দেখা করার পর চাটান ফিরে যাবার সময় মুঙ্গরী তাকে অবাক করে দিয়ে গাছতলাতে পাকড়েছিল, সেদিনই এক অঘটন ঘটে গেছে। এতদিনে এতবার চাটান-এর সঙ্গে মিলেছে সে কিন্তু এমন দুর্ঘটনা এই প্রথম!

বড় ভয়ে আছে মুঙ্গরী। এমনিতে তেমন ভয় ছিল না। বাগোট এমনকী বুজুবাবুর সঙ্গেও ব্যাপারটা ঘটলে ভয় পেত না। ভয় পেয়েছে আজ্জার কাছে একথা শুনে যে, টাংলাটোলির চাটান মুণ্ডা আসলে আজ্জা সিরকা মুণ্ডারই প্রথম বউ-এর বড় নাতি। সে মরেও গেছে আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। আর আজ্জার সঙ্গে তার "সাকামচারি"ও হয়ে গেছিল আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগে। তাই চাটান, মুঙ্গরীর ভাই-ই হল সম্পর্কে। ভাই-বোনের মধ্যে কোনো ব্যাপার মুণ্ডা সমাজ এখনও ক্ষমার চোখে দেখে না। সে বড় পাপের কথা।

একে তো 'সাকামচারি' না-করেই উসকির ঘর ছেড়ে এসে এবং বাউণ্ডুলে জীবনযাপন করে চাটান এই অঞ্চলের সকলের কাছেই "বাগী" হয়ে গেছে। সমাজ-বহির্ভূত। সমাজ ওকে টাঁড়ের মধ্যে হারিয়ে-যাওয়া বা মূয়া-ভূতে ভুলিয়ে-নেওয়া বলদ বা মোষের মতোই তাড়িয়ে দিয়েছে। একেই তো সে সমাজ-তাড়ানো মানুষ, তায় আবার রক্তসূত্রে বড় ভাই; তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক এবং সে সম্পর্কের ফল হিসেবে অন্তঃসত্ত্বা হওয়াতে মুঙ্গরীও সমাজ থেকে বিতাড়িত হবার সম্ভাবনার মুখোমুখি এসে পড়েছে। এই অবস্থার কথা মনে করে বেপরোয়াই হয়ে উঠেছে ও।

সেদিন রাতে পুরোনো কথা বলতে বলতে সিরকা আজ্জা বলেছিল আদর করে নাতনি মুঙ্গরীকে। জানিস তো মুঙ্গরী, ওই উসকির বর চাটান ছেলেটা ওর সব দোষ সত্ত্বেও আমাকে টানে কেন?

কেন?

অবাক হয়ে মুঙ্গরী শুধিয়েছিল।

টানবে না? আসলে ওর মধ্যে যে আমারই রক্ত বইছে। ওর আজ্জির নাম ছিল হাঁসসি। বড় তেজি মেয়ে। কিন্তু শরীর বড়ই প্রবল

ছিল ওর মধ্যে। মনে হত যেন কোনো বেদেনির রক্ত বইত ওর শরীরে। তোর আজ্জা সিরকা-মুণ্ডা দশ-বিশ গাঁয়ের প্রধান হবার জন্যেই জন্মেছিল। তার পক্ষে যত রূপ আর তেজই থাক না কেন, সেই মেয়ের সঙ্গে ঘর করা সম্ভব ছিল না। তাই "সাকামচারি" করে তোর এখনকার আজ্জি ঝারিওকে বিয়ে করি আমি। এই কথা তোর আজ্জি জানে আর জানে এ-গাঁয়ে সে-গাঁয়ের ক'জন বুড়ো-বুড়িরা, যাদের বয়স আশি-পঁচাশি হয়েছে এবং এখনও যারা বেঁচে আছে।

এতোদিন একথা বলোনি কেন আমাকে আজ্জা?

স্তম্ভিত গলায় শুধিয়েছিল মুঙ্গরী।

বলব কেন? বলার তো কোনো প্রয়োজন ঘটেনি। সেদিন তুই চাটান-এর কথা বললি, আর চাটান ইদানীং ঘন ঘন আমার কাছে আসছে তাই ওর কথা উঠল বলেই বললাম। মনেও পড়ে গেল; বলতে পারিস। ওর নাক-চোখ-চিবুক সব ওর আজ্জির মতোই হয়েছে। হাঁসসি মরে গেছে তাও তো আজ পঞ্চাশ বছর হবে। কামান্দা গ্রামে বাড়ি ছিল ওদের। চাটানকেও কখনও আমি বলিনি একথা। কে জানে, হাঁসসির দ্বিতীয় স্বামী গাঞ্জু কখনও জানিয়েছিল কিনা ওদের। সেও মরে গেছে আজ চল্লিশ বছর হল। চাটানের মা যে আমারই মেয়ে সে-কথাও চাটান জানে কিনা জানি না। চাটান যখন তার মায়ের পেটে তখনই মারা যায় তার স্বামী নাটান। ও কোনোদিনও আমাকে বলেনি, আমিও কোনোদিন বলিনি। ওদের গাঁয়ে একবার ওলাওঠা মারি এসেছিল তখন এত লোকই মারা যায় যে লোকে আর পরম্পরা নিয়ে মাথা ঘামায়নি তার পরে। যারাই বেঁচে থেকেছে তারাই বর্তে গেছে। অবশ্য চাটানের মা বিসপাতিয়াও মারা যায় ওই মারিতেই। তখন চাটানের বয়স পাঁচ-ছয়ই হবে। ঠিক মনে নেই।

চাটানকে আমি বলব?

মুঙ্গরী বলেছিল।

সিরকা মুণ্ডার কণ্ঠস্বর রুক্ষ হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, তোর সঙ্গে ওর দেখা হয় নাকি? কোথায় দেখা হয়?

ধরা পড়ে গেছিল মুঙ্গরী। বলেছিল, এই এখানে-ওখানে। হাটে-টাটে।

দেখিস নাতনি। সাবধান। ওর কাছ থেকে অনেকই কারণে সাবধান। ও একদিন ভরদুপুরে ঝিরপানির "নাগে-এরা"র পুকুরে চান করেছিল। ওর সঙ্গে উসকির কোনো সম্পর্ক নেই অথচ ও "সাকামচারি" নেয়নি এখনও। গত বছরে ওর পা কেটে গেছিল তার পর ঘা হয়ে যায়। সেই ঘায়ে নীল-মাছিরা ডিম পেড়েছিল। তারপর "খুম্বুরু-জম্বুরি"র অপরাধ তো আছেই। সোনার লোভ ও একাই করেনি, সবাইকেই সেই লোভ ধরিয়েছে। ও "রাণু-দা" হয়ে গেছে। ওর একেবারে সামনেই ওর শেষের দিন ওত পেতে আছে। ওর সঙ্গে কোনোরকম ভাব-সাব করতে যাসনে যেন। করলে, তুইও "রাণু-দা" হবি। তোরও শেষের দিন এগিয়ে আসবে। তোকে আমি খুবই ভালোবাসি মুঙ্গরী। আমার নাতনি বলেই শুধু নয়, তুই সুন্দরী বলে, তোকে দশ-গাঁয়ের মানুষ ভালোবাসে বলে। তুই আমাদের বড় আদরের রে মুঙ্গরী। তা কি তুই বুঝিস না?

মুঙ্গরী বলল, বুঝি আজ্জা।

মনে মনে বলল, আর কী! এখন তো বোঝাবুঝি সবই শেষ।

কি রে?

মুঙ্গরীর চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে শুধোল সিরকা মুণ্ডা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুঙ্গরী বলল, নাঃ। কিছু না আজ্জা।

চাটান-এর সঙ্গে লুকিয়ে-চুরিয়ে দেখা করিস নাকি তুই? কখনো করিস না। তোর মতো মেয়ের জন্যে ভালো ছেলের কি অভাব এত বড় দিশুম-এ?

মুঙ্গরী উত্তর দিল না। যা হবার তা তো হয়ে গেছে সবই। এখন দুজনেই তো "রাণু-দা"।

কথা বলছিস্ না যে? কী রে?

আজ্জার মুখের দিকে চেয়ে চোখের পাতা না কাঁপিয়ে মিথ্যে কথা বলল মুঙ্গরী। আরে, তুমি তো বলেইছো যা বলার। করব না।

আজ্জার মুখের উপরে এত বড় মিথ্যাটা বলার জোর কী করে পেল ও নিজেই জানে না। কিন্তু ভিতরের এক অচেনা উৎস থেকে জোর এল। নিজেই অবাক হয়ে গেল ও।

এই তো আমার সোনার মেয়ে, সোনার নাতনি! বলে, বুড়ো সিরকা মুণ্ডা মুঙ্গরীর মাথাটা নিজের লোল-চর্ম দু-হাতের মধ্যে নিয়ে আদর করে দিল। বিড়বিড় করে বলল, সোনালেকান।

মুঙ্গরী, আজ্জার আদর শেষ হলে বলল, তুমি তোমার নাতি চাটানকে ভালোবাসো না আজ্জা? তুমি?

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল সিরকা মুণ্ডা। এই হঠাৎ প্রশ্নে থতমত খেয়ে গেল। তারপর বলল, নিশ্চয়ই বাসি। ওর শরীরেও যে আমারই রক্ত বইছে রে মুঙ্গরী। শুধু ভালোইবাসি না; ওকে সমীহও করি। আজ থেকে নয়, ওর শিশুকাল থেকে। ও একটা ছেলের মতো ছেলে। অমন একটা ছেলে নেই দশ-বিশ গাঁয়ে। কিন্তু ওর দিদিমার রক্ত যে আছে ওর শরীরে। ঘর-বাঁধা ওর রক্তেই নেই। ঘর-ভাঙার রক্ত নিয়েই এসেছে ও। দেখিস তুই! কত ঘর যে ভাঙবে ও এই এক জীবনে! কিন্তু লোভে পড়ে বা মতলব করে ভাঙবে না। চাটান-এর মধ্যে এমন কিছু আছে যে, যে-মেয়েই ওর কাছে আসবে সেই তার জন্যে পাগল হবে। কিন্তু ও যে নিজেই পাগল। একজনকে সুখী করার পর তার দুঃখের দিকে না তাকিয়ে বাঁশি বাজাতে বাজাতে অন্যের বুকে ছুটে যাবে। ওকে যেই ভালোবাসবে, তারই অশেষ দুঃখ।

আর?

মুঙ্গরী বলল চোখ নিচু করে।

আর, শুধু মেয়েদের ব্যাপারেই নয়, ও পুরো গ্রাম, পুরো সমাজকে পুরো লণ্ডভণ্ড করে দেবার ক্ষমতাও রাখে। স্বভাব-নেতা ও। একদিকে দাঁড়িয়ে ও যদি ডাক দেয় তবে অন্যদিকে দাঁড়ানো আমার ডাক উপেক্ষা করেও সব মরদেরা ওর দিকেই চলে যাবে। ও আমার প্রতিদ্বন্দ্বীও বটে। তবে কী জানিস, নেতৃত্বের গুণ থাকলেই হয় না রে, নেতার কিছু গড়ে তোলার গুণও চাই। কিছু তৈরি করার! ভেঙে ফেলার মধ্যে, সে ঐতিহ্যই হোক কী সামাজিক বা রাজনৈতিক ব্যবস্থাই হোক; কোনোই বাহাদুরি নেই। সে তো যুগে যুগে অনেকেই ভেঙেছে, মন্দির, শান্তি, দুর্গ, স্থিতি; অনেকই অত্যাচার করেছে। তাদের মধ্যে, ভেঙে ফেলেও নতুন করে গড়ে নেবার ক্ষমতা ক'জনের ছিল বা থাকে মা বল্? তার পেছনে অনেক দিশুম-এর লোকবল থাকলেই কেউ নেতা হয় না, দলের উদ্দেশ্য কি সেইটাই নেতার নেতৃত্বের বড় বাহাদুরি! ও স্বভাব-নেতা যে, সে-কথা ও নিজেই জানে না। এর চেয়ে বিপজ্জনক দোষ কোনো নেতার মধ্যে আর কিছুই হতে পারে না। ও নিজের জীবন নিয়েই ছিনিমিনি খেলছে মনে করে, আমাদের পুরো সমাজের জীবনকেও নষ্ট করে দিতে পারে একেবারেই আচম্বিতে।

চাটান তাহলে, তাড়িয়ে-দেওয়া মানুষ হিসেবে সারাজীবনই একা একা থাকবে? ওকে রেঁধে দেবার কেউ থাকবে না; ওকে সঙ্গ দেবার কেউ?

থাকবে না কেন? বললাম তো, অনেকেই থাকবে। তবে ও ঘর কারও সঙ্গেই বাঁধবে না। বলেছি না, ওর শরীরে বেদেনির রক্ত আছে। তুই কি চাটানকে ভালোবাসিস নাকি? কী সর্বনাশ!

মুঙ্গরী বলল, আমার খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই যেন! অন্যের বরকে ভালোবাসতে যাবো কোন দুঃখে?

এই তো! এই তো আমার বুদ্ধিমতী নাতনি!

দূর থেকে দেখতে পেল মুঙ্গরী চাটানকে। উবু হয়ে বসে নদীর পারে শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ছে আর বীজ পুঁতছে। ওর চারদিকের প্রকৃতি, পৃথিবী, পরিবেশ সবকিছু সম্পর্কেই ও এই মুহূর্তে উদাসীন। সম্পূর্ণই উদাসীন। নিজের কাজের মধ্যেই একেবারে বুঁদ হয়ে রয়েছে।

সকালের রোদ তখনও নরম ছিল। মুঙ্গরীকে দেখতে পেয়েই চাটান উঠে দাঁড়িয়ে, হাসল। তারপর মুঙ্গরী কাছে যেতেই লালমাটি-মাখা হাতেই জড়িয়ে ধরে তাকে চুমু খেল। সমস্ত মন বিবশ হয়ে গেল মুঙ্গরীর। মনে মনে বলল, এই মানুষটাকেই নাকি সমাজ তাড়িয়ে দেয়! এর কাছে এলেই নাকি অমঙ্গল! এই নাকি "রাণু-দা"? পরম দুর্ভাগ্য অপেক্ষা করে আছে নাকি ওরই জন্যে? তাই যদি হয়, তাহলে মুঙ্গরীর এত বুদ্ধি সব মিথ্যা, ভালোত্ব মিথ্যা; মুঙ্গরীর মা-হওয়ার সম্ভাবনাও মিথ্যা, এমনকি মিথ্যা আকাশময় আলো-ছড়ানো এই প্রচণ্ড সত্য, প্রত্যক্ষ সিঙবোঙার জাজ্বল্যমান অস্তিত্ব!

কী গাছ লাগাচ্ছ চাটান, তোমার একার কী দায়? ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর?

দায় যারা কাঁধে নেয় মুঙ্গরী, দায়টা চিরদিনই তাদেরই একার। শুধু গাছ লাগানোর দায়ের কথাই বলছি না, সব দায়ের কথাই বলছি। কিন্তু তুই দেখে নিস। একদিন এই দিশুম, দিশুমের পর দিশুম কেমন সবুজে-সবুজ হয়ে যাবে। আমার নাম করবি তোরা সকলে, তোর ছেলে-মেয়েরা; খুঁটি থেকে টেবো-ঘাটের মধ্যের সব গাঁয়ের মানুষেরা।

ছেলেমেয়েরা কথাটা তুলতেই মুঙ্গরীর মুখে বুকের মধ্যের কথাটা এসে গেছিল। কিন্তু চাটানের নিষ্পাপ, সরল, উসকির-দেওয়া

আঘাতে আহত অন্য জগতের সেই মুখটির দিকে চেয়ে সে এই মুহূর্তের গাছের লতার-পাতার-ফুলের অনাবিল স্বপ্নে-বিভোর চাটানকে কথাটি বলতেই পারল না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুঙ্গরী বলল, তাও তো তোমার ঘর থাকলেও বা বুঝতাম!

চাটান হাসল। হাসলে চাটানকে ভারি সুন্দর দেখায়। বলল, কে বলেছে ঘর নেই? যখনই যে ঘরেই যাব আমি সেই ঘরই আমার ঘর।

মুঙ্গরী আঁচলের গিঁট খুলে বলল, এই নাও। খাও।

কী ওগুলো?

শিশুর কৌতূহলে বলল চাটান।

আমসত্ত্ব আর কাঁটালের বীচি ভাজা। মা আমাকে দিয়েছিল। আর এই টিফিন-ক্যারিয়ারে দুপুরের খাবার তো আছেই!

বাঃ! আজ তো রীতিমতো ভোজ তাহলে। তুইও খা। আমি নদীতে হাতটা ধুয়ে আসি।

চাটান ফিরলে, মুঙ্গরী বলল, তুমি কী কী গাছ লাগাচ্ছ?

যে গাছই পাচ্ছি, যে বীজ পাচ্ছি; তাই। এই রোদে তো চারা বাঁচবে না। তাই গর্ত করে করে নানা গাছ-পাতা-লতার বীজ পুঁতে দিচ্ছি। বর্ষা নামলেই নতুন প্রাণের সঞ্চার হবে। বীজের অঙ্কুরিত হওয়া গাছে গাছে নতুন পাতা যেদিন বৃষ্টির পর প্রথম ফুটে বেরোয় তা দেখতে যে কী ভালো লাগে তা কী বলব! তুই দেখেছিস?

এই কথাক'টিতে মুঙ্গরীর সারা শরীর যেন মঞ্জরিত হয়ে উঠল। ঠোঁট নড়ে উঠল একবার। কিন্তু মনের কথা মনেই রয়ে গেল। নিজেকে অঙ্কুরিত কোনো গাছ বলে মনে হল। তবুও নিজেকে বলল মুঙ্গরী, পরে, পরে।

চাটান বলল, বেশি করে লাগাচ্ছি আম, লিচু, কাঁঠালের বীচি। শালের বীজ। শিমুলের। বাঁশের গোড়া। বয়ের। ক্ষয়ের। তাছাড়াও

জরিবুটিতে যেসব গাছ-লতা কাজে লাগে, যেমন হাড়কান্‌কালি, পস্‌রা, কালমেঘ, গ্যাঁদা, গোড়বাজ ঘাস, করৌঞ্জ, গোল্‌চি আরও কত কী।

তুমি জড়িবুটি জানো বুঝি?

জানি না? তোর তো মা আছে, আজ্জি আছে, তোর না জানলেও চলে। ছেলেবেলা থেকে তো আমি একা একাই বড় হয়ে উঠেছি। বাবা মরে গেছিল আমি জন্মাবার আগেই। আর মা মরে গেছিল পাঁচ বছর বয়সে। মামাবাড়িতে প্রায় একা একাই বড় হয়ে উঠেছি। লাথি-ঝাঁটা খেয়ে। তাই তো আমি বদ্‌মেজাজি এমন।

কি জানো জড়িবুটি তুমি?

ধর পেট খারাপ হলে, মানে বারে বারে ময়দানে যেতে হলে, আমের বা পসরা বা শিমুলগাছের ছিল্‌কা ছেঁচে রস করে নিয়ে তারপর ছেঁকে খেলেই ভালো হয়ে যাবি। হজম যদি না হয়, কালমেঘ-এর রস। ঠাণ্ডা লেগে যদি জ্বর হয়, তবে গোলমরিচ আর রসুন, সর্ষের তেলের সঙ্গে গরম করে শরীরে মালিশ করলেই একদম চাঙ্গা। যদি মাথা ব্যথা করে তবে বাঁশপাতা, বয়েরের পাতা, পেয়ারার পাতা, পুকুরের পাশে যে গোড়বাজ ঘাস হয়, সেই ঘাস এইসব একসঙ্গে পিষে নিয়ে কপালে ন্যাকড়ার ফালি দিয়ে বেঁধে দিলেই ব্যসস্‌। যদি হাত-পা মচ্‌কে যায়, তবে হাড়কাঙ্কানি গাছের গায়ে গায়ে যে লতা ঝোলে বা হাড়কাঙ্গানির ছাল ভালো করে পিষে নিয়ে করৌঞ্জ বা কাড়ুয়ার তেল গরম করে গোল্‌চি বা শালের পাতায় দিয়ে, তার উপরে ন্যাকড়ার ফালি দিয়ে বেঁধে দে। বেঁধে দিয়ে তারপর হাত বা পা আগুনে একটু সেঁকে নে, ব্যসস ব্যথা সঙ্গে সঙ্গে কমে যাবে। আস্তে আস্তে ভালোও হয়ে যাবি। আরও কত্তরকম জড়িবুটি আছে। তোর কিছু হলে আমাকে বলিস, দেখিস, আমি কম বড় ভগত্‌ নই!

মুঙ্গরী একদৃষ্টে চাটান-এর মুখে চেয়েছিল। বলল, বাব্বা! কত্ত কী জানো তুমি!

তুইও জানিস।

চাটান বলল।

কী?

তা বলব না, বলেই হাসল চাটান আবার।

চাটান হাসলেই মুঙ্গরীর সঙ্গে সঙ্গেই চুমু খেতে ইচ্ছে করে তাকে।

কেন বলবে না?

চাটান মুখ-চোখের এমন একটি ভঙ্গি করল, তা বলার চেয়েও বেশি হল!

মুঙ্গরী ভীষণ কপট রাগের সঙ্গে বলল, পাজি কোথাকার! বলেই হেসে ফেলল।

খাবারটা খাওয়া হতেই গাছের ছায়ায় দুজনে ঘন হয়ে বসল। তাজনার জলের পাশে তখনও ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব ছিল একটা। হঠাৎ চাটান তার সুরেলা গলাতে গান ধরে দিল। প্রতিটি পর্দা সুরে একেবারে ভরপুর।

মুঙ্গরী ভাবছিল চাটান আর ও মিলে তো গানের দলও বানাতে পারে একটা।

"দোলাংহো পিরিওসুরি হুন্দি বা।
দোলাংহো শুশুম্‌কোতেলা।।
দোলাংহো ইচাচিংড়িচম্পায়েরা।
দোলাংহো কারামেকোতেলাং।।"

চল প্রিয়া, হুন্দিফুলের মতো সুন্দরী, চল আমরা নাচতে যাই। ইচা ফুল চিংড় ফুল আর চম্পা ফুল সেজে নাও, চল আমরা নাচতে যাই।।

মুঙ্গবী দুলতে দুলতে গাছে হেলান দিয়ে বসে চাটান-এর হাতে হাত রেখে গাইতে লাগল :

"কাইঞাহো গাতিং বাঙ্গাইয়া।
কাইঞাহো শুশুন্‌কোতেদো।।
কাইঞাহো সাঙ্গানিওবাঙ্গাইয়া।
কাইঞাহো কারামেকোতেলাং।।"

না, না, না। আমি নাচতে যাব না। তোমার সঙ্গে প্রেম আমার নেই। আমার জুড়ি যে সেই নেই, তাই তোমার সঙ্গে কারমা নাচতে আমি যাব না।

চাটান হাসতে হাসতে এবার গাইল :

"দোলাংহো শুশুম্‌রেলাং নামিঞা।
দোলাংহো শুশুমকোতেলাং।।
দোলাংহো কারামেরেলাংচিলাইয়া।
দোলাংহো কারামেকোতেলাং।।"

চল, চল প্রিয়া, কারমা নাচের জায়গায় গেলেই তোমার জুড়িকে খুঁজে পাবে তুমি!

মুঙ্গরী গাইল :

"কুড়িহো আয়াররেচিতায়াম্‌রে।"



●

ওদের সঙ্গে বিশাল কাকাও ঘুরে ঘুরে গাছগাছালির পরিচর্যা করছিলেন একদিন সকাল বেলা। আজকে ঝকঝকে রোদ। কাকাকেও একটা টোকা দিয়েছে সুনয়নী রোদ থেকে মাথা বাঁচাবার জন্যে। অরণিকেও দিয়েছে।

কাকা থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, আরে তমু। এই গাছটা কোথা থেকে পেলি?

কোন গাছ?

আরে, ওই যে মাদার গাছেদের মধ্যের গাছটা।

তারপরই বললেন, অশোক, শিমুল, পলাশ যখন ফুটবে তখন মাদারও ফুটবে। লালে লাল হয়ে যাবে। সব সি.পি.এম. হয়ে যাবে। তবে যখন শুধুই লালে অরুচি ধরে যাবে। তখন কুসুমগাছেও নতুন পাতা আসবে মাওবাদিদের মতো—ফিনফিনে পাতা—মাছের রক্ত-ধোওয়া জলের মতো কালচে লাল। যারা জানে না, তারা পাতাগুলোকেই ফুল বলে ভাববে।

তারপর বললেন, তার আগে বল ওই গাছটা কোথা থেকে পেলি?

ওটা তো পলাশ।

পলাশ তো বটেই। কিন্তু কী পলাশ?

তা তো জানি না। নার্সারি থেকে ট্রাক ভর্তি করে নানা গাছ আনিয়েছিলাম। ওদের লোকও গাছ লাগানোর সময়ে সঙ্গে ছিল। কিন্তু পলাশই তো বলেছিল, আর তো কিছু বলেনি।

ওটা তো সাদা পলাশ।

সাদা পলাশ? ওরা সমস্বরে বলল।

হ্যাঁ। এই গাছ দুর্লভ। এই গাছের বটানিকাল নাম 'বুটিয়া ফ্রন্ডোসা'। বটানিস্ট রক্সবার্গ এই নামকরণ করেছিলেন। এর আরও একটি নাম আছে বিউটিয়া মনোস্পার্মা। হ্যাঁ মনোস্পার্মা। মনোস্পার্মা মানে হচ্ছে একবীজপত্রী।

তারপরে বললেন, আমিও কি ছাই জানতাম? আমাকে কলকাতার চিড়িয়াখানার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সুকান্ত ভট্টাচার্যই বলেছিল। সেই মানুষটা সারাজীবন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরই থেকে গেল অথচ সেই একা হাতে চিড়িয়াখানা চালায়। ব্যাচেলার, হাইলি নলেজেবল, ডেডিকেটেড জীবজন্তু গাছগাছালি নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসে অথচ তারই উন্নতি হয় না এদেশে। সে পারপেচুয়ালি অ্যাসিস্ট্যান্ট গিরি করে যাচ্ছে। কারণ? তার নাকি টেকনিকাল কোয়ালিফিকেশন নেই। হায়। সব গান্ডু কি আর আমি সাধে বলি? এদেশ চালায় দেখন-হাসির দল। প্রকৃত গুণীর কদর হয় না। তারা চিরদিনই বস্তাচাপা পড়ে থাকে সরকারি ফাইলে। অবশ্য মানুষটার নিজের পদের কোনো মোহ নেই। সত্যিই নেই। আমরা যারা তাকে জানি, তারাই দুঃখ পেয়ে মরি।

এখানে এল কী করে এ গাছ?

তমাল বলল অবাক হয়েই।

আগে লাক্ষা চাষের জন্যে এই গাছ ব্যবহার করা হত। তাই হয়তো এই অঞ্চলে কিছু গাছ রয়ে গেছিল। এরই অন্য একটি প্রজাতি হচ্ছে লতানে পলাশ। এই সাদা পলাশের ব্যবসায়িক নাম 'বাংলা কিনো'। বাসন্তী রঙা পলাশ গাছও দেখা যায়, যদিও খুবই দুষ্প্রাপ্য। প্রকৃতির মধ্যে কত বৈচিত্র্য। দেখে দেখে বুঁদ হয়ে যেতে হয়। বুঝলি কিনা। 'ভ্যারাইটি ইজ দ্যা স্লাইসেস অফ লাইফ।'

তারপর বললেন, তোরা তো সবুজায়ন করছিস সে তো খুবই ভালো কথা কিন্তু তারই মধ্যে এইরকম সব দুষ্প্রাপ্য গাছও লাগাবি। নইলে, তোদের সঙ্গে অশিক্ষিত মানুষদের তফাত কী থাকবে।

তারপর বিশাল কাকা বললেন, লালে লাল করার সুবন্দোবস্ত তো করেছিসই তোরা—বিমান বোস ও সীতারাম ইয়েচুরিরা দেখে খুশি হবেন। কিন্তু রং হিসেবে লালই থাকলে ভালো দেখাবে না। ওদিকটাতে অনেকগুলো জারুল লাগিয়ে দে আর জ্যাকারান্ডা —বেগুনি ফুলে ফুলে ভরে যাবে আকাশ—তাতে লালেরও বাহার হবে।

জ্যাকারান্ডাটা কী গাছ?

জ্যাকারান্ডা সম্ভবত আফ্রিকান গাছ অথবা অস্ট্রেলিয়ান।

তারপর বললেন, বুঝলি, ভারত মহাসাগরের বুকের সেশ্যেলস দ্বীপপুঞ্জে ফ্লামবয়ান্ট নামের একটি বড় গাছ হয় আমাদের কৃষ্ণচূড়ার মতো—তার ফুল সত্যিই ফ্ল্যামবয়ান্ট। ঠিক বোঝাতে পারব না সে গাছের কথা, একেবারে বাড়ির দাঙ্গা লাগায় সেই গাছ। যখন জাহাজে কাজ করতাম তখন একবার যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল সেখানে। ওই একবারই। আর হবে না। আমি এখন গাণ্ডুদের দেশে ঝান্টুমারি হয়ে আছি। আজীবন তাই থাকতে হবে।

জানি না আমাদের দেশে সে গাছ কেউ এনেছেন কি না। এসব ব্যাপারে ইংরেজ আর জার্মানদের কোনো তুলনা নেই। ভারতে সারা পৃথিবী থেকে গাছ এনে লাগিয়েছিল ইংরেজরা। আমাদের গাণ্ডুরা কি আর তা করবে! তবে শুধু এ দুই জাতই কেন ফরাসিরাও অনেক গুণে গুণী ছিল।

তবে সেশ্যেলস আইল্যান্ডস ছিল ফরাসিদের তাঁবে। আসলে নানা দেশেরই জলদস্যুদের ঘাঁটি ছিল স্যেশেলস—পরে রাশিয়া ন্যাভাল বেস করে। অনেক সাবমেরিনও থাকত। তবে ফরাসি প্রভাব এখনও রয়েই গেছে।

—ওখানকার মানুষেরা কি ফরাসিতে কথা বলে?

ফরাসি জানে, ইংরেজিও জানে। তবে সাধারণ লোকের ভাষা হল ক্রেয়ল। ফরাসি-মিশ্রিত একটি আফ্রিকান ডায়ালেক্ট।

আপনি এত জানলেন কী করে। সেশ্যেলস-এ কি গেছিলেন?

ঋদ্ধি বলল।

নারে গাণ্ডু। বই পড়ে জেনেছি।

তারপর হেসে বললেন, বললাম না গেছিলাম একবার। তবে শুধু গিয়েই কি আর সব জানা যায়। দেশটাকে ভালো লেগেছিল বলে ওই দেশ নিয়ে অনেক পড়াশুনা করেছিলাম। পড়াশুনা করেছিলাম হাওয়াই যান আইল্যান্ডস নিয়ে রাজা কামেহামেহা আর জেলে পাখিদের দেশ। ঘরে বসে পড়াশুনা করে যা জানা যায় তা কি জানা যায় পৃথিবী ঘুরে? তাহলে তো 'ভ্রমণ' পত্রিকার অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর মতো অনেকেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে যেতে পারতেন। হ্যাঁ তবে পড়াশুনো করার পরেও যদি দেশ দেখা যায় তবে আরও ভালো হয়। কিন্তু শুধু দেশে দেশে ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে ঘুরলেই হয় না কিছু অমরেন্দ্র চক্রবর্তী বা সব্যসাচী চক্রবর্তীদের মতো। দামি ক্যামেরার লেনস আর চিন্তাশীল গরিব মানুষদের চোখে তফাত চিরদিনই ছিল এবং থাকবে। এই সামান্য কথাটাই তোদের কলকাতার ধৃতিকান্ত লাহিড়ি চৌধুরির মতো হস্তী-পণ্ডিত বা তোদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের সর্বজ্ঞ রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধি বা হস্তী-সদৃশ আনন্দবাজার পত্রিকার মতো মদমত্ত হস্তী মূর্খরা বুঝে উঠতে পারেন।

একটু চুপচাপ থেকে পাহাড়ে উঠতে উঠতে বললেন, বিভূতিভূষণ বাঁড়ুজ্যের 'চাঁদের পাহাড়' লিখতে কি আফ্রিকাতে যেতে হয়েছিল? লণ্ঠনের আলোতে তক্তপোশের উপরে বসে ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক জার্নালস ও আরও অন্যান্য অনেক বই পড়েই তিনি 'মরণের ডংকা বাজে' বা 'চাঁদের পাহাড়' লিখেছিলেন।

তারপর বললেন, তোরা কি জানিস যে সত্যি সত্যিই পশ্চিম

আফ্রিকার রুয়েঞ্জোরি রেঞ্জ-এ 'মাউনটেইন অফ দ্যা মুন' নামের এক বরফাবৃত পাহাড় আছে।

কী করে জানলেন? রেবতী বলল।

গাণ্ডুরে, বই পড়ে জানলাম। 'মাউনটেইন অফ দ্যা মুনের' ফোটোও দেখেছি আফ্রিকার উপরে লেখা সেই বইয়ে।

তমালদা বলল, কাকা আপনাদের মতো মানুষদের এই দোষ। তোমরা এত জান যে তোমাদের জ্ঞান ডিফিউজড হয়ে যায়। আমরা প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছি। হচ্ছিল সব গাছের কথা।

—আর কী কী গাছ চেনেন আপনি—মানে, আনকমোন গাছ—সাদা পলাশের মতো?

—বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি? তবে একটু বেশি হয়তো জানতে পারতাম পাগল গাণ্ডুগুলো যদি তিন-তিনটে বছর আমাকে পাগলা গারদে ঢুকিয়ে না রাখত। সেখানে পড়াশোনা বলতে তো গাণ্ডু আনন্দবাজার আর ঝান্ডু স্টেটসম্যান। এখন তো ওইসব পড়েই সবাই পণ্ডিত হচ্ছে!

—আরও দু'একটা গাছের কথা বলুন না কাকা।

কাকা বলল জানিস, কালকে শেষ রাতে হঠাৎ ইসাবেলাকে মনে পড়েছে। আহা! আমারও কী সব সুখের দিন ছিল রে। আবার সেই সুখের দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে।

বলেই, গেয়ে উঠলেন, "আমি স্বপ্নপারের ডাক শুনেছি, তাই তো ভাবি জেগে জেগে, কেউ কখনও খুঁজে কি পায় স্বপ্নলোকের চাবি, আমি স্বপ্নপারের ডাক শুনেছি।"

বলনা তমু, দিবিনা?

ইসাবেলা, ইসাবেলার সঙ্গে দেখা করতে যাব আমি তমু। সাইকোর হাটে সেই ছোঁড়াটা কী বলল রে? ওই ছোঁড়ার কাছে ইসাবেলার ঠিকানাটা ঠিক পাওয়া যাবে। আমাকে জোগাড় করে দে তমু। ইসাবেলাকে মনে পড়েছে। সে নইলে আমি বাঁচতাম না

সেবারে। আমার জন্যেই তার চাকরি গেছিল মিশন থেকে। কথা দে, জোগাড় করে দিবি ঠিকানাটা।

তমুদা বলল, দেব। দেব কাকা। সত্যিই চেষ্টা করব।

ইসাবেলাকে আমি একটি মেয়ে দেব বলেছিলাম। কথা রাখা হয়নি। এবারে দেব। ঠিক দেব। কিন্তু দিতে কি পারব? অব্যবহারে আমার যন্তরটি যে এখন গুহাবাসী হয়ে গেছে। সে কি জাগবে? যাকগে শালা! আমার কী? যার গরজ সেই জাগিয়ে নেবে। শালা, আমার কী?

ঋদ্ধি তাঁর মনোযোগ ফেরাতে বলল, গাছের কথা বলুন কাকা, গাছের কথা।

ঠিক বলেছিস। গাছেদের ভালোবাসা স্বার্থহীন ভালোবাসা। নদীর ভালোবাসাও তাই। ওরা শুধু ভালোইবাসে এক তরফা, বদলে কিছুই চায় না। ওরা মানুষের মেয়েদের মতো খচরি নয়।

গাছের কথা।

ঋদ্ধি আবার বলল।

হ্যাঁ। মিশনের গির্জার পাশে একটা গাছ ছিল, অস্ট্রেলিয়ান গাছ, নাম 'গ্লিনিসিডিয়া সুপার্বা'। সাদা কাগজের ফুলের মতো ফুল ফুটত মার্চ-এপ্রিলে। খুব বড় গাছ নয়, বড় হাইবিসকার-এর মতো।

পাখি বলল, হাইবিসকাস মানে?

আরে গাধি, হাইবিসকাস মানে জবা। তোরা ডম মরেসের কবিতা এখন না পড়লে আর কবে পড়বি? মেনোপজ হয়ে গেলে?

পাখির গাল লাল হয়ে গেল।

কাকা বললেন. "শো মি দ্যা হাইবিসকাস ফ্লাওয়ার বিটউইন ইওর থাইজ।"

পাখি অন্যদিকে চেয়ে রইল।

জবার অনেকই রং হয় তবে ডম মরেস নিশ্চয়ই রক্তজবার কথাই মিন করেছিলেন।

তারপর বললেন, ওই সুপার্বা গ্লিনিসিডিয়া গাছ আরও একটি দেখেছিলাম পালামৌর বেতলার আদি বন বাংলোতে। বাংলোর হাতাতে। বাংলো আর বাবুর্চিখানার মধ্যিখানে। জানি না, গাছটি আজও আছে কিনা। আর জ্যাকারান্ডার কথা বলছিলাম না? পালামৌর কেঁড় বাংলোর সামনে একসময়ে সারি করে লাগানো ছিল। বেগুনি ফুলে চোত-বোশেখে ছেয়ে যেত, নীচে ফুলের গালিচা পাতা হত। তা বনবিভাগের চুথিয়ারা সব কটা গাছকে একদিন কেটে ফেলল। বলল কী না, পোকা লেগে গেছে। তা নিজেদের পোঁদেও তো অনেক পোকা—পোঁদগুলো কেটে ফেললেই হত।

ওরা সকলে স্তব্ধ হয়ে শুনল বিশাল কাকার কথা। তমাল ঠিক করল মেয়েদের ফেরত পাঠিয়ে দেয় ডুংরিতে। ওরই না হয় কাকা, মেয়েদের তো কেউ নয়। তারা অত খিস্তি-খেউড় শুনবে কেন? মনে হল, পাগলের উপরে দয়া হল ওদের। যে ভাবে রি-অ্যাক্ট করার কথা ছিল, সেভাবে করল না।

তোমরা কি ক্যাম্পে ফিরে যাবে?

তমাল বলল ওদের।

মেয়েরা সমস্বরে বলল, একদম না। আমরা বিশাল কাকার কোম্পানি দারুণ এনজয় করছি—ইভরি মোমেন্ট অফ ইট।

কাকা বললেন, অনেকগুলো জ্যাকারান্ডা ছিল বেতলা যাওয়ার পথে চান্দোয়া টোড়ির ঘাটের উপরে আমঝরিয়ার বাংলোর ড্রাইভেও। অনেকগুলো গাছ। চোত-বোশেখে কী সুন্দর যে দেখাত। সেগুলোও বনবিভাগের গাণ্ডুরা কেটে ফেলল।

একটু পরে বিশাল কাকা বললেন, আমার শরীরটা ভালো লাগছে না, আমি গিয়ে একটু ঘুমোব।

তমাল, ঋদ্ধিকে সঙ্গে পাঠাল। বুধাই-এর কাছে কাকার ওষুধপত্র রাখা আছে এবং কাকা আসার পর থেকে সে কাকার ঘরেব বাইরে দরজার সামনে চৌপাই পেতে শুতে যাচ্ছেও রোজই রাতে।

ওষুধ সব বোঝানোই আছে। অন্য ওষুধ যা আছে তা তো আছেই তার উপরে দিনে তিনবার ট্র্যাঙ্কুলাইজারও দেওয়া হয়। রাঁচীর ডঃ পাণ্ডের চিকিৎসাধীন আছেন কাকা। আসলে রাতে বেশ বেশি ডোজের ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়। তারই প্রভাব থাকে সকাল দশটা এগারোটা অবধি। কোনো কোনোদিন আবার মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়—তখনই মুশকিল হয়। সকলের ঘুম ভাঙিয়ে রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দ বা শক্তি চট্টোপাধ্যায় আবৃত্তি করেন। নয়তো ইংরেজিতে কল্পিত ছাত্রদের পড়ান। কাকার জ্ঞানের ভাণ্ডার তো অসীম। তবে সকলের ঘুম ভেঙে যায় এইটাই হয় অসুবিধার। সারাদিন সকলেই কায়িক পরিশ্রম করে। গামহারডুংরী থেকে নীচের নতুন-টাঁড়-এ একবার নামা ও ওঠাই যথেষ্ট পরিশ্রমের। তার উপরে আজকের মতো ডুংরির উপরের মালভূমিতে ঘুরে বেড়ালেও কম পথ হাঁটা হয় না। নিচু হয়ে বসে গাছের পরিচর্যা করতেও পরিশ্রম লাগে। নিচু হয়ে জল দেওয়া, সার দেওয়া, গাছের গোড়া নিড়োনো সবেতেই পরিশ্রম তাই রাতের ঘুমটা সকলেরই জরুরি।

তমাল, ঋদ্ধিকে চোখ দিয়ে ইশারাও করে দিয়েছিল যাতে বুধাই কাকাকে একটা ট্রাঙ্কুলাইজার দিয়ে দেয় জলের সঙ্গে। ওটা পড়লেই কিছুক্ষণ ঝিম মেরে পড়ে থাকবেন। তারপরে ওরা সকলে যখন খাওয়ার জন্যে ফিরবে ডুংরিতে তখন ওঁর ঘুম ছেড়ে যাবে। সকাল থেকে এই চড়া রোদে কম ঘোরা হয়নি তার উপরে কথাও বলেছেন অনর্গল।

খারাপও লাগে। একটি প্রাণোচ্ছল, জ্ঞানী, বড় দুঃখী মানুষকে এভাবে জোর করে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে। কিন্তু উপায়ই বা কী?

কাকা চলে যেতেই তমাল ওদের বলল, তোরা বাকিটা দেখ। আমি আজই খুঁটিতে যাব। ইসাবেলার খোঁজটা নেওয়া হচ্ছে না। সেদিন সাইকোর হাটে ছেলেটি কাকাকে চিনতে পেরেছিল এবং ইসাবেলার কথাও বলেছিল। কাকার মাথাতে তখন ব্যাপারটা রেজিস্টার করেনি।

হাট থেকে ফেরার পরে হয়তো মনে পড়েছে। তমাল প্রসঙ্গ বদলে বলল, সর্বক্ষণ আজ সকাল থেকে তাই ইসাবেলা ইসাবেলা করছেন।

তমাল ভাবছিল ভদ্রমহিলার সঙ্গে কাকার একটা যোগাযোগ যদি করিয়ে দেওয়া যায় তবে উনিই কাকার ভার নেবেন হয়ত। কাকা যে পাখিদের সামনে ক্রমাগত মুখ খারাপ করে যাচ্ছেন সেটা ওরা বেশিদিন সহ্য নাও করতে পারে। ওরা সবুজায়নের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এত কষ্ট করে গামহারডুংরীতে থাকছে, তমালের পাগল কাকার উটকো ঝামেলার বিরুদ্ধে কিছুদিনের মধ্যেই ওরা সোচ্চার হতে পারে। তেমন হলে কাকাকে আবার রাঁচীতে রেখে আসতে হবে অথবা কাঁকে রোডের হাসপাতালে ভর্তিও করিয়ে দিয়ে আসতে হতে পারে। এখন কাকার লুসিড ইন্টারভ্যাল চলছে কিন্তু পরে পাগলামিটা যখন পুরো ফিরে আসবে এবং কখন যে আসবে তা কেউই বলতে পারে না; তখন এই পাণ্ডববর্জিত জায়গাতে কাকাকে সামলানো খুবই মুশকিল হবে। সেই পাগলামি কী রূপ পরিগ্রহ করবে তাও আগে থেকে বলা সম্ভব নয়। তমাল, কাকাকে নিয়ে ন্যায্য কারণেই খুবই চিন্তিত। ছেলেমেয়েগুলো খুবই ভালো বলতে হবে, তাই এখন পর্যন্ত সব কিছুই গুড-হিউমারে নিয়েছে। কিন্তু পরে?

তুমি তো খাওয়ার আগে ফিরতে পারবে না তমুদা।

নাঃ। তার কোনো সম্ভাবনা নেই। তবে খুঁটিতে খাওয়ার জায়গা অনেকই আছে। আমার জানাশোনাও কম নেই। কারও বাড়িতে ডাল রুটি খেয়ে নেব। কিন্তু যে কাজে যাচ্ছি সেটি সিদ্ধ হলেই হয়। ফাদার মার্কেজ মুণ্ডার সঙ্গে দেখা হলেই অনেক খবর পাওয়া যাবে। কাকাতো খুঁটিতে মিশনে কাজ করতেন সে আজ প্রায় আট বছর হয়ে গেল। কলকাতাতে ডঃ নন্দীর কাছে চিকিৎসা করানো হয়েছিল তিন চার বছর আমার মামার বাড়িতে রেখে। তারপরে ডঃ নন্দীর উপদেশেই কাঁকেতে এনে ভর্তি করি। ভর্তিটা আমিই করিয়েছিলাম। ছাড়িয়েও আনি আমিই বাবা তার অনেক বছর আগে চলে গেছিলেন। কাকার কোহেশান এর অভাব হয়েছে বহুদিন হল তাই সব গুলিয়ে ফেলেছেন।

তারপর ওদের সকলকে উদ্দেশ করে তমাল বলল, তোরা সবাই আমাকে ক্ষমা করে দিস আমার কাকার জন্যে। তোদের আর কী বলব বল? উ্য আর ভেরি কনসিডারেট।

ওরা সমস্বরে বলল, কী যে বল তমুদা। একজন অসুস্থ মানুষ কিন্তু প্রগাঢ় পণ্ডিত মানুষ। উনি এখানে থাকলে আমাদের সকলেরই লাভ। তাছাড়া তোমার কাকাতো আমাদেরও কাকা। আমাদের কারও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রও তো এমন হতে পারত।

পাখি বলল, এখন তো মস্তিষ্ক-বিকৃতি আর অ্যালঝাইমার ঘরে ঘরে হচ্ছে তমুদা। কাকারই ভাষাতে বললে বলতে গেলে প্রকৃতির অভিশাপ বা প্রতিশোধ। 'খুম্বুরু-জুম্বুরি'র শাস্তি এসব। আরও কত শাস্তি আমাদের পেতে হবে ভবিষ্যতে কে জানে! দিন তো পড়ে আছে।

—আমি তাহলে আগামী কালই ঘুরে আসি খুঁটি থেকে। সকাল সকালই বেরিয়ে পড়ব।

—হ্যাঁ সেই ভালো। পাখি বলল।

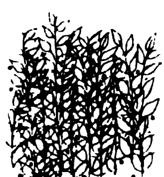
ওরা সকলেই সেই কথাতে সায় দিল।

বললেনও তো শেষ রাতে স্বপ্ন দেখেছেন। ভোরের স্বপ্ন তো সত্যি হয়।

মুণ্ডু। রুরু বলল।

কেন?

আমি কাল ভোরে স্বপ্ন দেখেছি যে আমি তামারের রাজা হয়ে গেছি আর সেখানের যত রিঙ্গিচিঙ্গি-চিকনপিণ্ডা মেয়েরা আমার পায়ের কাছে বসে পদসেবা করছে।



ঋদ্ধি বলল, অত খুম্মুরি-জুম্মুরি ভালো না রুরু। বুঝেছ?

ঋদ্ধির কথাতে ওরা সকলেই একসঙ্গে হেসে উঠল।

ঋদ্ধি আর পাখি বিকেলে চা খেয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল। পাখি বুঝতে পারে যে ঋদ্ধির তার প্রতি এক বিশেষ দুর্বলতা আছে। কিন্তু পাখির মন জুড়ে আছে তমালদা। অথচ তমালদার সঙ্গে কথাবার্তা, নিতান্ত কাজের কথা ছাড়া, খুব কমই হয়। কথা হোক আর না হোক পাখির মন জুড়ে যেমন তমাল আছে তমালের চাউনি দেখেই তার মেয়ে-মন বুঝতে ভুল করে না যে এতজন মেয়ের মধ্যে একমাত্র পাখিকেই তমাল এক বিশেষ চোখে দেখে। চোখে চোখেই কথা যা হয়েছে হবার এ পর্যন্ত কিন্তু তার চোখ ভুল পড়েনি।

সব মেয়েরেই বন্ধু অনেক থাকে কিন্তু বয়-ফ্রেন্ড, বা যাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন তারা দেখে সে একজনই। একমাত্র।

ঋদ্ধিও ছবি টবি আঁকে। তবে পাখির মতো সে ছবি-বিশারদ নয়। আর্ট স্কুলেও পড়েনি কখনও পাখির মতো। এই গামহারডুংরীর নিসর্গর মধ্যে অজস্র ছবি যার চোখ আছে সেই দেখতে পারে। মনের মধ্যে অজস্র কম্পোজিশন দানা বাঁধে।

ঋদ্ধি বলল, তোমার কিন্তু ছবি আঁকা আবার শুরু করা উচিত।

পাখি বলল, এই যে নিত্যনতুন গাছ লাগাচ্ছি এও তো ছবি আঁকা। লেখাও ছবি আঁকা। গগন ঠাকুর বলতেন না, 'ছবি লেখেন'।

তা ঠিক।

আমি রোজ রাতে ডায়েরি লিখি দু-তিন পাতা করে। সে পাতায় পাতায় ছবি ফোটে—ছবি না আঁকলেও।

সত্যি? একদিন পড়াবে আমাকে?

না। ডায়েরি শুধু নিজেরই জন্যে লেখে মানুষে। সেই অন্তর্বাস-খোলা চেহারা অন্যকে দেখানোর জন্যে নয়। বড়জোর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শুধু নিজেকেই তা দেখানো যায় অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় নিজেকেই দেখা হয়।

বাঃ। কী সুন্দর কথা বলো তুমি।

জানি না।

ঋদ্ধি বলল, সেই ছেলেবেলা থেকে তো বটেই এবং ইদানীং আরও বেশি, নানা শব্দ পড়ি ছবির সমালোচকদের সমালোচনাতে কিন্তু মানে বুঝি না। ছবির সমালোচনা তো আজকাল প্রায় সব সংবাদপত্রই প্রতি সপ্তাহে করে। হঠাৎ ছবি নিয়ে এত মাতামাতির কারণ কী?

প্রথম কারণ হল যে, বাংলার সবচেয়ে বড় কাগজ নিজেরাই আর্ট গ্যালারি করেছে। ছবি তাদের কাছে একটি বড় ব্যবসা হয়েছে আর এ কথা তো ঠিক লেখকদের চেয়ে এখন চিত্রীদের বাজার দর অনেক বেশি। সকলেই তো আর আমার মতো অভাগা শিল্পী নয়।

জীবনে লাইন চুজ করাই ভুল হয়ে গিয়েছে। হয় ক্রিকেট খেলা উচিত ছিল নয় ছবি আঁকা। হুসেইন-টুসেইন এর কথা বাদই দিলাম। গত বছর শান্তিনিকেতনের একজন শিল্পী শুনলাম দু'কোটি টাকা অ্যাডভান্স ট্যাক্স দিয়েছেন। তার মানে বছরে ছ'কোটি টাকা রোজগার।

বলো কী?

ঠিকই বলছি। এখন বড় বড় চিত্রী আর ক্রিকেটারদের আয়ের উপরে মোটা হারে ইনকাম ট্যাক্স লাগানো উচিত। নইলে এঁদের এমন

আয় সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য আরও বাড়াবে। এটা ঠিক নয়। পার্থিব পটেল এবার স্কুল ফাইনাল না হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষাতে বসবে সে কয়েক কোটি টাকার মালিক। সৌরভ বা শচীন কী এমন মহৎ কর্ম করেছেন যে যখন লক্ষ লক্ষ অধ্যাপক, সংগীতশিল্পী, কবি-সাহিত্যিক অনাহারে অর্ধাহারে আছেন, পেনশন এর সামান্য আয়ে। তাও যাঁরা পেনশন পান। অনেকে প্রায় না খেয়ে আছেন। এর পিছনে যুক্তি কোথায়?

সুধীরবাবু মানে, সুধীর মৈত্র, শুনেছি সুধীরবাবু দক্ষিণেশ্বরে একটি ছোট্ট বাড়ি করে মাথা গোঁজার বন্দোবস্ত করে চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর দু'একটি কাগজে অলংকরণ করে সামান্যই রোজগার করেন। অথচ বিকাশ ভট্টাচার্য তাঁরই ছাত্র ছিলেন। আর্ট কলেজে এবং সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় বিকাশবাবুর ছাত্র ছিলেন। বিকাশবাবু এখন অসুস্থ হলেও ছবি আঁকেন। সুব্রতবাবু তো আঁকেনই। পুরো খবর রাখি না তবে মনে হয় বিকাশবাবু নিশ্চয়ই কোটিপতি এবং সুব্রতবাবু এখনও কোটিপতি না হলেও বহু লক্ষপতি।

এটা সুধীরবাবুদের মন্দ ভাগ্য। সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত না নিতে পারার মাশুল গুনছেন এঁরা। ভুলে গেলে চলবে না যে একটা সময় ছিল যখন কমার্শিয়াল আর্টিস্টরা ফাইন আর্টস-এর শিল্পীদের থেকে অনেক সচ্ছল ছিলেন। অসীম ধৈর্যে, না-খেয়ে, আধ পেটা খেয়ে অনেক ফাইন আর্টস শিল্পীদের বেঁচে থাকতে দেখেছি আমি। সেই অসীম ধৈর্যের দাম আজকে পাচ্ছেন ওঁরা এবং ওঁদের উত্তরসূরিরা। ওঁদের ঈর্ষা না করে অভিনন্দিত করা উচিত।

ঈর্ষা আমি করি না। তবে ঈর্ষার মতো রিপু তো আর নেই। জগতে কৃতী মানুষ জীবনের সব ক্ষেত্রেই ছিল এবং কম সফল আর অসফলরা তাঁদের চিরদিনই ঈর্ষা করে গিয়েছেন। তবে সুধীরবাবুদের ব্যাপারটা অন্য। ওঁরা নিজেরাও অত্যন্ত কৃতী পুরুষ এবং ঈর্ষাও

কাউকেই করেন না তবে জীবনের একটি মোড়ে এসে, বড় রাস্তার মোড়ে এসে ভুল পথে হাঁটার জন্যে, ঠিক বাসটি মিস করার জন্যে তাঁদের আর্থিক সাফল্য তেমন আসেনি। তা বলে তাঁরা তো ছোট শিল্পী নন। সুধীর মৈত্র বা সমীর সরকার আজও যদি ফাইন আর্টস-এ আসেন তবে অনেক শিল্পীই অসুবিধায় পড়বেন। আসলে আজকালকার অনেক বড় বড় শিল্পীও দেখেছি, যাদের ফিগার ড্রয়িংই আসে না, পোর্ট্রেটও আসে না। ছবির নামে আজকাল সবকিছুই চলে যাচ্ছে এবং তার মধ্যে অধিকাংশই আমারই মতো তালিম না-পাওয়া সবজান্তা। গানই বলো, ছবিই বলো, তালিম একটা বড় ব্যাপার। গলাতে সুরই লাগে না, অথচ মঞ্চে বসে গান গাইতে বা নিজের গরজে ক্যাসেট বা সিডি করতে কারোরই কোনো অসুবিধা নেই। নিখিল ব্যানার্জি বা পরিতোষ সেনদের যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন সব ক্ষেত্রেই স্বয়ম্ভূরা মিডিয়ার হাত ধরে বৈতরণী পার হয়ে যাচ্ছে। লজ্জাতে ঘেন্নাতে গা-রি-রি-রি-রি করে।

ঋদ্ধি বলল, যুগের হাওয়া এসব। তবে এইসব গাইয়ে বা আঁকিয়েরা থাকবেন না। তালিম ছাড়াও সার্থক শিল্পী বা গায়ক কেউ হতে পারেন না। এমন নয়, উস্তাদ মৈজুদ্দিনেরা সব ক্ষেত্রেই থাকেন, তবে তাঁরা সব কুদরতের দান। খোদা বা ঈশ্বরের পরম কৃপাধন্য তাঁরা। তাঁরা পালের গোরু ছাগল নন। তাঁরা ক্বচিৎ দেখা দেন।

তারপর বলল, আমার মূল প্রশ্নের জবাব কিন্তু তুমি এড়িয়ে গেলে। ছবির সমালোচকেরা যেসব শব্দ ব্যবহার করেন তার অনেকগুলিরই মানে আমি বুঝিনি কোনোদিন। হাতে অভিধান, মানে ছবি সম্পর্কিত অভিধান নিয়ে বসলে জানতে পারতাম কিন্তু তেমন সুযোগ-সুবিধা হয়নি। বলবে কি দয়া করে?

—বলব না কেন? তবে আমি আর কতটুকু জানি।

Baroque মানে কী?

বারোক মানে, কী বলব? এলাবরেট। হাইলি অর্নামেন্টাল ডেকরেটিভ স্টাইলকে বলে বারোক।

আর কোলাজ মানে?

এই প্রশ্নটা ভালো। অনেকেই শব্দটার প্রকৃত মানে না জেনে ভুল-ভাল ভাবে ব্যবহার করেন।

আসল মানেটা কী?

আসল মানে হচ্ছে নানা জিনিসের টুকরো-টাকরা সেঁটে যে ছবি হয় তাই। গ্রিক শব্দ Kolla যার মানে আঠা, তা থেকেই কোলাজ।

আর Stipple মানে?

ওলন্দাজি শব্দ STIP বা ইংরেজি শব্দ Point থেকে এসেছে Stipple.

Brio মানে?

Brio মানে Liveliness, Vivacity. হাওয়ার্ড হপকিন্স নামের একজন ক্লাসিক্যাল শিল্পীর ছবির রংচঙে ক্যানভাসগুলি এই Brio-র জন্যে বিখ্যাত।

ঋদ্ধি বলল Atelier মানে কী?

পাখি হেসে বলল, ওটি একটি ফরাসি শব্দ। মানে হচ্ছে স্টুডিও। বিখ্যাত ফরাসি শিল্পীরা সাম্রাজ্যবাদীদের স্টুডিওতেই গোড়াপত্তন করেন নিজেদের।

আর গুয়াশ মানে? Gouache ?

—গুয়াশ মানে হচ্ছে জল রঙের সঙ্গে আঠা মিশিয়ে যে ছবি আঁকা হয়।

হ্যাচিং মানে কী? Hatching ?

আরে তুমি দেখছি আমার পরীক্ষা নিচ্ছ।

ঋদ্ধি বলল, পরীক্ষা নয়। আমাদের জানার তো ইচ্ছে হয়। নাকি আমরা শিল্পী নই বলে অজ্ঞই থেকে যাব।

হ্যাচিং হচ্ছে সূক্ষ্ম সমান্তরাল লাইন এঁকে Shading করা। স্থাপত্যতেই বেশি ব্যবহৃত হয় হ্যাচিং।

আর Daub মানে কী?

ঋদ্ধি বলল।

উরি বাবারে!

পাখি বলল।

তারপর বলল, লাতিন Dealbare থেকে Daub শব্দটি এসেছে। Dealbare মানে হোয়াইটওয়াশ। যাচ্ছেতাই crude অদক্ষ আর্টিস্টের কাজকে বলে Daub. আমার সব কাজই Daub তা বলা চলে।

Idyll মানে?

পিকচারাস্ক অথবা আইডিয়ালাইজড ছবি। যেমন ভিক্টোরিয়াল যুগে' শান্ত নিসর্গ দৃশ্যগুলি।

বলেই বলল, আর আমি জবাব দেব না যতই প্রশ্নবাণে জর্জরিত হই না কেন!

সত্যিই আমরা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেললাম, কী বলিস? এবার প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া যাক।

পাখি, তুমি তো ছত্তিশগড়েও অনেকদিন ছিলে। সেখানের কথা, সেখানের আদিবাসীদের কথা একটু বলো না শুনি। তোমার তো অ্যানথ্রোপলজিতেও খুবই ইন্টারেস্ট আছে।

বলল ঋদ্ধি।

—তা আছে কিন্তু লে-ম্যানের ইন্টারেস্ট।

তারপর বলল, কতরকম যে আদিবাসী আছে ওই সব অঞ্চলে তা কী বলব। যেমন গোন্দ, মারিয়া গোন্দ, গোন্দ গাওয়ারি, গাওয়ারি মারিয়া, ভুলিয়া, ভিল, ভাটরা, ভারিয়া, ভৈনা, বাইগা, মুণ্ডা ইত্যাদি।

ার হিন্দুদের যেমন বর্ণাশ্রম প্রথা ছিল এবং সেই অনুযায়ী

জাত-পাতের ভেদ ছিল এদের মধ্যেও তা আছে। এখনও আছে। তবে এই বৈষম্যের শিকার তাদের হিন্দুদের মতো হতে হয়নি।

জীবিকাশ্রয়ী এইসব জাতপাত। তাই না?

ঋদ্ধি বলল, ঠিক তাই।

গাদারিয়া মানে, যারা গবাদি পশু এবং ভেড়া ছাগল চরায়। গড়বা একরকমের জংলি প্রজাতি। গঞ্জমালি হচ্ছে গ্রামের পুরোহিত এবং সেবকরা। এদের অনেকেই এসেছিল ওড়িশা থেকে।

তার পর?

গড়পাগারি হলেন এক দেবতা যিনি শিলাবৃষ্টির হাত থেকে ওদের রক্ষা করেন। সাপ পোষ মানায় এবং নানা ভেল্কি যারা দেখায় তাদের বলে গাউড়িয়া। যারা ঘাস কাটে তারা ঘাসিয়া। যারা মোষ চরায় তারা খোসি। গোন্দ হচ্ছে জংলি আদিবাসী এবং যারা কৃষিকাজ করে। গন্ধালি বলে তাদের, যারা ধর্মীয় ভিখিরি। এদের আরেক নাম গোঁসাই।

বাবাঃ। তুমি এত মনে রাখলে কী করে!

ঋদ্ধি বলল।

যে বিষয়ে ইন্টারেস্ট থাকে তাই সহজে মনে থাকে। আমিও মাঝে মাঝে ভাবি এত অল্পদিনে কী করে মনে রাখলাম।

তারপর বলল, আরও আছে। আসলে সন্ধের পর গভীর বনাবৃত জায়গাতে তো কিছু করার থাকে না একমাত্র পূর্ণিমার রাত ছাড়া, তখন বন্ধ দরজার ভিতরে ঘরে বসে অথবা ঘরের বাইরে আগুন জ্বালিয়ে তার পাশে বসে বুড়ো-বুড়িদের মুখ থেকে নানা কথা, গল্প, ওদের ইতিহাস শুনতে ভারি ভালো লাগে আমার। সেইসব গল্প শুনতে শুনতে কোথায় যেন চলে যাই। আমাদের দেশ যে কত বড়, কত বিচিত্র, কত হাজার বছরের ইতিহাস এর, কতরকমের মানুষের আবাস এদেশে তা ভাবলেও রোমাঞ্চিত হতে হয়। রাতের বেলা

খাপরার চালের মধ্যে যখন সাপে ইঁদুর তাড়া করে বেড়ায়, প্রাচীন সব গামহার আর চাঁর গাছের পাতায় পাতায় রাতের হাওয়া ফিসফিসানি তোলে তখন অনেক কথাই মনে হয়।

তারপর? আরও বলো ওদের কথা।

হ্যাঁ। চাষ যারা করে তাদের বলে গুজর। গুরাও বলে গ্রামের পুরোহিতকে। হালবা বলে এক ধরনের জংলি আদিবাসী আছে। যারা জংলি বা পোষা জানোয়ারের চামড়া ট্যানিং করে তাদের বলে হোইলা। যোদ্ধাদের বলে হাটকার। যারা মিষ্টি বানায় তাদের বলে হালওয়াই—এই নাম অবশ্য সারা দেশেই চালু আছে। যারা নৌকা চালায় অথবা মাছ ধরে তাদের বলে কেওট, অথবা ইনঝায়ার। গোপাল এবং যাদুয়া নামের ক্রিমিনাল কাস্ট আছে। কালার বলে তাদের, যারা মদ চোলাই করে। কানজার হচ্ছে জিপসি এবং দেহপসারিনী।

এ তো সব পেশা নির্ভর জাত হল। এ ছাড়াও তো অনেক জাত আছে। সেগুলোর কথাও বলো।

ঋদ্ধি বলল।

পাখি বলল, ঋদ্ধিকে। কোলি, কোরবু, কোরোয়া, কোল, খন্দ, খড়িয়া, কাওয়ার ইত্যাদি অনেক জাত আছে ওদের মধ্যে। মারিয়া মুরিয়াদের কথা ছেড়েই দিলাম। মারিয়া মুরিয়াদের মধ্যেও কত বিভাগ আছে। সেসবের কিছু কিছু আমার ডায়েরিতে লেখা আছে। ডায়েরিটা কোথায়?

সেসব ডায়েরি হারিয়ে গেছে।

অনেক সময় অতীতকে মাড়িয়ে যাওয়াই ভালো।

ঋদ্ধি বলল, এ প্রসঙ্গ থাক। তুমি বলে যাও। থামলে কেন?

কসবিও বলে দেহপসারিনীদের।

সে কী?

ঋদ্ধি বলল।

কেন?

উচ্চাঙ্গ সংগীতের জগতে আতাই আর কসবি বলে দুটি শব্দ আছে।

তার সঙ্গে রূপোপজীবিনীদের কোনো সম্পর্ক কিন্তু নেই।

তা হবে। আমি জানি না।

ঋদ্ধি বলল,—বলো পাখি।

—যারা কাঁসার কাজ করে, আমরা তাদের যেমন কাঁসারি বলি তেমন ওরা বলে কাসির। লেখক ও কেরানিকে বলে করণ।

—আমাদের করণিক কথাটি কি এই করণ থেকেই এসেছে?

ঋদ্ধি জিগগেস করল।

তা জানি না। খাটিক হল খাসির মাংসের কারবারি। কির, কিরারি বা কোহলি হচ্ছে যারা চাষবাস করে তারা। কাদেরা বলে তাদের, যারা বাজি মানে ফায়ারওয়ার্কস তৈরি করে। কাইকারি মানে গরিব মানুষ যারা ঝুড়ি-চুপড়ি বানায়। কালার মানে, যারা মদ বিক্রি করে। কারিয়া বলে তুলো চাষিদের। জলাহা হচ্ছে যারা তাঁত বোনে তারা। যারা কাচের চুড়ি বানায় তাদের বলে কাচেরা।

তারপর হেসে বলল, আর কত বলব বল?

—না না, ঢের হয়েছে। আমার তো এর মধ্যে কসবি ছাড়া আর একটিও নাম মনে থাকবে না।

ঋদ্ধি বলল।

ঋদ্ধি আরও বল। ভালো লাগছে শুনতে।

—ভালো লাগছে না বোরড হচ্ছ।

—বোরড হলে তোমাকে তো বলতামই।

—সুগন্ধির কারবার যারা করে, মানে বানায়, তাদের বলে আতরি। আতর থেকে এসেছে সম্ভবত শব্দটা।

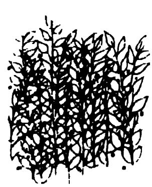
তোড়না গ্রামে কি আতর মাখার লোকও আছে? কসবি যখন আছে তখন তো থাকারই কথা।

আমি যে গ্রামে ছিলাম সেখানে গ্রামে একজনও কসবি বা আতরিও ছিল না। তারা অন্য অনেক বড় গ্রামে ছিল। যখন প্রতি সপ্তাহে বড় হাট লাগে তখন তাদের তাঁবু পড়ে সেখানে। মুকড়ি নামের একটা বড় গ্রামের হাটে আমি গিয়েছিলাম। সেখানে পুরুষেরা বড় গাছতলাতে খাটানো রঙচঙা কসবিদের তাঁবুতে যখন চোর চোর মুখে হাত দিয়ে মুখ আড়াল করে সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়ে তখন তা দেখার মতো।

ঠাট্টা কোরো না পাখি। বিধাতা পুরুষদের বড় দুর্বল করে গড়েছেন আর সেই দৌর্বল্যের পূর্ণ ব্যবহার শুধু কসবিরাই নয়, প্রত্যেক নারীই করে। করে যে, তা আমি হলপ করে বলতে পারি।

পাখি বলল, আসলে পুরষমাত্রই সেক্সিস্ট। এইসব প্রসঙ্গ একবার উঠলে তোমরা আহ্লাদে একেবারে আটখানা হয়ে যাও। এসব যে নিভৃতে নির্জনে উচ্চারিত হওয়ার জিনিস তা তোমাদের মনে থাকে না। অবশ্য তোমরা সবাইই যে একরকম তা বলব না। অনন্যও তো পুরুষ। অনন্য কখনও এমন কুরুচিকর প্রসঙ্গ তোমার মতো ফেনাবে না।

আমাদের তমালদা তো শুধুমাত্র পুরুষই নন, তিনি তো মহাপুরুষ। তাই তো নষ্ট পুরুষ আমি তাঁর পায়ের কাছে এসে বসেছি। এই গাছতলাতে বসেই আমি শাক্যসিংহ বোধিলাভ করে একদিন বুদ্ধদেব হব। দেখো তুমি!



পরদিন সকালে নাস্তা করেই বেরোল তমাল।

ডুংরী থেকে নেমে নতুন-টাঁড়-এ পৌঁছিয়ে তাজনা নদীর পাশে সিন্নুর চা-বিস্কুটের দোকান থেকে সাইকেলটা নিয়ে পিচ রাস্তার দিকে চলল তমাল। এই সাইকেলটা ওরা সকলেই প্রয়োজন মতো ব্যবহার করে। তমালই কিনেছে। সিন্নুও ব্যবহার করে প্রয়োজনে। সাইকেলে করে ধুরুয়া মোড় অবধি গেলে পথ কিছুটা কমবে। ধুরুয়া মোড়ে বনিয়া চম্পালাল-এর দোকানে সাইকেল রেখে বাসে চলে যাবে খুঁটি।

নদীর পারে ওদের স্কুলের দ্বিতীয় ঘরটি উঠছে। আগে একটাই ঘর ছিল এবং তমালরাই মাস্টার। মাটির দেওয়াল, মাটির দাওয়া, খাপরার চাল। সামনের ফাঁকা জমিতে চারটি কৃষ্ণচূড়া এবং আম কাঁঠাল ও পেয়ারা গাছ লাগিয়েছে। ছাত্ররা খেতে পারবে ফল ধরলে। একটা কুয়োও খোঁড়া হয়েছে। স্কুল বাড়ি বানাবার জন্যে জলেরও প্রয়োজন ছিল। নদীর ধারে বলে বটে, কিন্তু নদী বেশ কিছুটা দূরে। গরমের দিনে অতদূর যেতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বেশ কষ্ট হয়। ডাঙা জমিটা কাছিমপেঠা বলে স্কুলের জায়গা থেকে পরিষ্কার দেখা যায় নদীটাকে। একটা বাঁক নিয়ে চন্দ্রপুরার দিকে চলে গেছে। ওই শেষ সকালে কয়েকটি কোঁচ বক ওড়াওড়ি করছে শান্ত নদীর ওপরে। একজোড়া মাছরাঙা জলে ঝাঁপাঝাঁপি করছে। একদল সুগা মাথার ওপরে চাবুকের মতো ডাকতে ডাকতে কচি কলাপাতা

সবুজের ঝলকানি তুলে উড়ে গেল। এখানের মানুষেরা টিয়াকে সুগা বলে। শহরের মানুষ টিয়াকে খাঁচায় ভরে ছোলা খাওয়ায় আর এখানের মানুষ টিয়ার ভয়ে শঙ্কিত থাকে সব সময়ে। এদের জন্যে কোনো ফসলই করতে পারে না। মানুষের মধ্যেও সুন্দরীদের মধ্যে অনেকেই যে দুষ্টু হয়, ক্ষতিকারক হয় তার প্রমাণ এই টিয়ারা। তমালের জীবনেও টিয়া নামের একটি মেয়ে এসেছিল। সে এই টিয়াদেরই মতো।

সাইকেলের প্যাডল করতে করতে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল তমাল। তারপরে একটি স্বস্তির শ্বাসও। সেই মেয়ে বড় সাধারণ ছিল। বড় সাধারণ তার চাওয়া ছিল। তমালের যোগ্য সে কোনোদিক দিয়েই ছিল না। গুণ ছিল না, রূপ ছিল। রূপেই মজেছিল তমাল।

বর্ষার শেষ সকালের চড়া রোদে সাইকেলের প্যাডল করতে করতে তার পাখির কথা মনে হল। মেয়েটা তার চেয়ে কম করে দশ বছরের ছোট কিন্তু ব্যবহারে, সহবতে, কর্তব্যনিষ্ঠায়, রসবোধে, সাহিত্যপ্রীতিতে এবং সহমর্মিতাতে ভালো লেগে গেছে ওকে তমালের। একটু বেশিই ভালো লেগে গেছে। তবে পাখির কি লেগেছে ভালো? এই গামহারডুংরীর রাজা পাখির মতো উজ্জ্বল মেয়েকে কিই বা দিতে পারে। কলকাতাতে বা তার নিজস্ব জায়গাতে তার কত চাইয়ে আছে। তার জীবনে কত স্বপ্ন আছে। সুন্দর, অর্থনৈতিকভাবে সফল স্বামী, বাড়ি, গাড়ি, সমাজে স্বীকৃতি, সে কেন তার জীবনকে তমালের জন্য নষ্ট করবে। পাখিকে প্রস্তাবটা দেওয়ার মতো সাহস নেই দুর্দান্ত সাহসী তমালের। সাহসের অনেক রকম হয়। যে সাহসের মধ্যে স্বার্থপরতার গন্ধ মাখা থাকে তাকে সাহস বলে মানতে রাজি নয় তমাল। তাই বড় দ্বিধায় জরজর হয়ে থাকে সে।

অথচ একটা একটা করে দিন চলে যায়, ঝরে যায়, পলাশ ফুলের মতো। পলাশ তো চিরটাকাল ফুটবে না। সব ফুলেরই ফোটা শেষ হয় একদিন।

তবে পাখির চোখদুটি দেখে, তমালের প্রতি ওর ব্যবহার ও দৃষ্টি দেখে মনে হয় ওরও ভালো লেগেছে তমালকে। তবে গামহারডুংরীর এবং নতুন-টাঁড়ে লাগানো অগণ্য গাছের নতুন চারার একটিরই মতো এই চারাটিও সবে মাটি ধরেছে। এখনও অনেক বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ এবং শীতের প্রতীক্ষাতে থাকতে হবে সেই চারাকে। সুপ্ত থাকবে তাদের ভালোলাগা মাটির নীচের চারার শিকড়েরই মতো। সে গাছে কুঁড়ি আদৌ আসবে কি না, ফুল আদৌ ফুটবে কি না, তা ভবিষ্যৎই বলবে।

ওর বৈচিত্র্যময় জীবনে অনেকই শিখেছে তমাল এবং প্রতিনিয়ত শিখছেও। শিখেছে কাকার কাছে, বাবার কাছে, যেমন শিখেছে, যৌবনের দূতী এই ছেলেমেয়েদের কাছ থেকেও কম শেখেনি, শিখছে না। ওরা পোশাকে-আশাকে, কথাবার্তায়, হাঁটা চলায়, মানসিকতাতেও তমালদের প্রজন্মের চেয়ে অনেকই অন্যরকম। ওরা যা চায়, এখুনি চায়, তর সয় না ওদের। রমাপদ চৌধুরী অনেকদিন আগে একটি অসাধারণ উপন্যাস লিখেছিলেন তখনকার দিনের অল্পবয়সি ছেলেমেয়েদের নিয়ে। নাম দিয়েছিলেন 'এখনই'। Right now !

তবে তমাল অপেক্ষা করতে জানে। করবেও। ওয়াল্ট হুইটম্যানের সেই পংক্তি কটিতে ওর বিশ্বাস আছে।

"All Truths wait in all things
They neither hasten their own delivery nor resist it,
They do not need the obsteric forceps of the Surgeon."

চম্পালালের দোকানে গিয়ে পৌঁছাবার পরে পরেই বাসটা এসে গেল মুরহুর দিক থেকে। সাইকেলটা জিম্মা দিয়ে সে বাসে উঠে পড়ল।

খুঁটিতে নেমে মিশনের দিকে যখন হেঁটে যাচ্ছে তমাল তখনই দেখল ফাদার মার্কেজ মুন্ডা তাঁর নীল-রঙা মোটর সাইকেল করে বাজারের দিকেই আসছেন। কপাল ভালো বলতে হবে। তমালকে দেখে উনি নিজেই মোটর সাইকেল থামিয়ে খাল খরিয়াত পুছতাছ করলেন। কাকার খুবই কাছের মানুষ ছিলেন ফাদার মুণ্ডা। কাকার কথা সব বলল তমাল। কিছুই লুকোল না। তারপর একটু ইতস্তত করে হাসপাতালের সিস্টার ইসাবেলার কথাও জিগগেস করল।

একটু চুপ করে থেকে মুখ নামিয়ে ফাদার বললেন, ইসাবেলা তো আর সিস্টার নেই বেটা। মিশন ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। বিশাল পাগল হয়ে যাওয়ার পরেই। বিশাল যেমন ওঁকে ভালোবাসত তিনিও বিশালকে তেমনই ভালোবেসেছিলেন। তাছাড়া, ভালোবাসবেনই না কেন? বিশালতো ভালোবাসার মতোই মানুষ। আমরাও সকলে তাকে ভালোবাসতাম—এখনও তার কথা প্রায়ই ওঠে।

উনি কি খুঁটিতেই আছেন? কী করেন?

আছেন খুঁটিতেই। তবে শহরের বাইরে খুব নির্জনে থাকেন। অনেকখানি জায়গা নিয়ে বাগান করেছেন। ফুলের বাগান নয়। ফল ও অন্যান্য বড় বড় গাছের বাগান। দূর থেকে মনে হয় জঙ্গল। ছোট একটি বাড়ি করেছেন। দুটি ছোট বেডরুম আর মধ্যে ড্রয়িং-ডাইনিং। একটি মেয়ে আছে, মরিয়ম, ওঁকে দেখা শোনা করার জন্যে আর একজন মালি-কাম দারোয়ান আছে। কিছু মেয়ে ওঁর কাছে পড়ে নিয়মিত। তাছাড়া অনেককে তিনি নার্সিং-এর ট্রেনিংও দেন। হাসপাতালে কাজ করে, পরে সেসব মেয়ে, ঘরে এবং বস্তিতে কারও

অসুখ করলে তাদের সেবাযত্ন করে। খুবই সুনাম তাদের নার্সিং স্কুল থেকে পাশ করা না হলেও।

কী করে যাব আমি ওঁর কাছে। তা ছাড়া, আপনি তাও আমাকে দেখেছেন কয়েকবার ছেলেবেলাতে, উনি তো আমাকে চেনেন না!

ফাদার হাসলেন শব্দ না করে। বললেন, যে যাকে ভালোবাসে সে তার ভালোবাসার জনের কুকুর-বেড়ালকেও চেনে আর তুমি বিশাল এর একমাত্র ভাইপো, তোমাকে চিনবেন না? তুমি যখন এখানে এসে আমার সাইকেলটা (মোটর সাইকেল নয়, তখন তো সাইকেল ছিল) নিয়ে চরকি কাটতে তখন কি ইসাবেলা তোমাকে দেখেনি না বিশালই বলেনি তোমার কথা তাঁকে? তোমাকে উনি নিশ্চয়ই চেনেন। তবে এখন তুমি অনেক বড় হয়ে গেছ। তাছাড়া, তোমার কার্য-কলাপ, মুণ্ডাদের কাছে তোমার জনপ্রিয়তা সবই তো এখন রূপকথাই হয়ে গেছে। উই আর অল প্রাউড অফ ইউ তমাল। প্রাউড অফ গামহারডুংরী অ্যাজ ওয়েল।

তমাল বলল, থ্যাঙ্ক ইউ। ফাদার। মুখ নামিয়ে বলল তমাল।

তবে তুমি তো চিনে যেতে পারবে না বাবা। একটা সাইকেল রিকশা নিয়ে নাও। আমি রিকশাওয়ালাকে ডাইরেকশান দিয়ে দিচ্ছি। না দিলেও নিয়ে যেতে পারবে। ইসাবেলা দিদিকে খুঁটির সকলেই চেনে।

তারপর বললেন, তোমাকে আমিই পৌঁছে দিতে পারতাম আমার বাহনে, কিন্তু আমার বাড়িতে লাঞ্চ-এর জন্যে তামার থেকে কজন অতিথি আসছেন। আমি গেলে, দেরি হয়ে যাবে। তাছাড়া, রিকশা নিয়ে যাওয়াই ভালো। ওই রিকশাতেই ফিরে আসতে পারবে বাস রাস্তাতে।

বলে, তমালকে রিকশাতে চড়িয়ে দিয়ে ফাদার মার্কেজ মুণ্ডা মোটর সাইকেল ভটভটিয়ে চলে গেলেন।

লাল কাঁকরের পথ ধরে রিকশাতে ক্যাঁচোর কোঁচোর করতে করতে যখন ছোট শহরের এক প্রান্তে সিস্টার ইসাবেলার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছাল তমাল তখন প্রায় একটা বাজে। সত্যিই বাড়ি বলে মনে হয় না, মনে হয় জঙ্গল। রিকশাওয়ালা ঘণ্টা বাজাতে একটি লোক এসে ছোট লোহার গেটটি খুলল। কাঁকরে কুরকুর আওয়াজ তুলে বড় বড় গাছের ছাড়া পড়া পথে সিস্টার ইসাবেলার বাড়ির চওড়া সিঁড়ির সামনে রিকশা গিয়ে থামল।

সবে চান করে ওঠা একটি মুণ্ডা মেয়ে রিঙ্গিচিঙ্গি-চিকনপিণ্ডা হয়ে লাল শাড়ি আর কালো ব্লাউজ পরে এসে দাঁড়াল। আজ বোধ হয় খুঁটিতে হাট আছে। পথের লোকজন দেখেও তাই মনে হল। হাটে যাবে বলেই এত সাজুগুজু। চুলে ফুলও গুঁজেছে, চাঁপা ফুল।

তমাল বলল, দিদিকে বলো বিশাল বাবুর ভাইপো এসেছেন দেখা করতে।

মেয়েটি, খুব সম্ভব তার নামই মরিয়ম, এখানে নব্বই ভাগ আদিবাসীই খ্রিশ্চান, গিয়ে খবর দিল।

খুব সম্ভব উনি খাচ্ছিলেন। তমালকে ডেকে পাঠালেন ভিতরে।

যা ভেবেছিল তাই। উনি খাবার টেবিল-এ বসেছিলেন। তমালের সঙ্গে কথা বলার আগে মরিয়মকে বললেন, মুণ্ডারি ভাষাতে আরেকটা প্লেট আর দুটো সাইড প্লেট দাও। তারপর তমালের মুখের দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থেকে ইংরেজিতে বললেন, তুমি তো মস্ত হয়ে গেছ। যখন আসতে তখন তো ছোট্ট ছেলেটি ছিলে।

খুব ছোট ছিলাম না।

কথা পরে হবে। আগে খেয়ে নাও। রান্না বিশেষ কিছুই হয়নি। তুমি আসবে জানলে অনেক কিছুই রান্না করতাম। যা আছে, তাই

খাও আমার সঙ্গে। ছানার ডালনা, কুচো মাছের চচ্চড়ি। আর ভাত। টক দইও আছে।

তমাল বলতে গেল, কাকা...

এখন কথা নয়। যাও হাত ধুয়ে নাও বেসিনে। আর রিকশাওয়ালাকে বলে এস খেয়ে আসতে। তোমার তো যেতে দেরি হবে। অনেক কথা বলবে বলেই তো এসেছ। না কি?

শুনব বলেও।

আমার কথা বিশেষ নেই।

ওরা যখন খাচ্ছিল তখন আকাশ কালো করে এল। খুঁটিতে বিজলি বাতি আছে। তবুও হাত ধোওয়া হলে সিস্টার ইসাবেলার সঙ্গে তমাল বারান্দার বেতের চেয়ারে এসে বসল। ওঁর মুখ থেকে চোখ সরাতে ইচ্ছে করছিল না। কালোর মধ্যে এমন সুন্দরী খুব কমই দেখেছে। কাটা কাটা নাক চিবুক, দীঘল চোখ তো সুন্দরই কিন্তু ওঁর আসল সৌন্দর্য সারল্য আর আত্মিক মাধুর্য। আর বুদ্ধি তো ছিলই। যাঁর বুদ্ধি নেই, তিনি স্ত্রী বা পুরুষ যেই হন, বুদ্ধির মতো প্রসাধন আর দ্বিতীয় নেই। কখনই সুন্দরী বলে গণ্য হবার নন।

তমাল বলল, আমি তো আপনাকে কখনও দেখিনি আগে আপনি আমাকে চিনলেন কী করে! আপনারও তো আমাকে দেখার কথা নয়।

উনি একটু হাসলেন। বললেন তুমি যখন তোমার কাকার কাছে আসতে রাঁচী থেকে, ফাদার মার্কেজের সাইকেল নিয়ে সারাদিন টো-টো করে ঘুরতে তখন তোমাকে দেখতাম আমি। তোমার কাকা তোমাকে খুবই ভালোবাসতেন। আমাকে বলতেন, ওর ভিতরে আগুন আছে। একদিন ও অনেক কিছু পোড়াবে, হয়তো সেই আগুনে নিজেও ছাই হয়ে যাবে।

তমাল হেসে বলল, তাই?

তারপর তমাল বিশাল কাকার সব কথাই ওঁকে বলল, অনেকক্ষণ ধরে। ওর নিজের কথাও। গামহারডুংরীর কথা, ছেলেমেয়েদের কথা, স্কুলের কথা।

তারপর বলল, আমার মনে হয় আপনাকে দেখলে কাকা ভালো হয়ে যাবেন। আর যদি বিয়ে করতে পারেন, তাহলেও কথাই নেই।

উনি একটু হাসলেন। সে হাসি বড় বিধুর। বললেন, তমাল তুমি বয়সে আমাদের চেয়ে অনেক ছোট। নারী-পুরুষের মধ্যে বিয়েটা যেমন অনেক সময়ে সুখের বন্ধন হয় অনেকই সময়ে তা আবার দুখের বন্ধনও হয়। বন্ধনও হয়, মুক্তিও হয়। এখন আমার বিয়ের বয়স আর নেই। বিয়ের ইচ্ছেও নেই। বিয়ে করাটা খুব সাহসের কাজ। আবার খুব সাধারণ কাজও। যে-কেউই তা করে ফেলতে পারে এবং করেও। কম বয়সে হঠাৎ করে করে না ফেললে সম্ভবত বিয়ে আর করা যায় না।

তারপর বললেন, তুমি কি জানো যে তোমার কাকা আমাকে ভালোবেসেছিলেন বলে অথবা আমিও তাঁকে ভালোবেসেছিলাম বলে মিশন থেকে আমাকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। তবে আমি মিশনকে ছাড়িনি। একজন দীক্ষিত সিস্টারের জীবনে প্রেমগর্হিত অপরাধ। সেবাতেই আমাদের জীবন নিবেদিত হবার কথা।

তোমার কাকা পাগল হয়ে গিয়ে কম কষ্ট পাননি বা এখনও পাচ্ছেন না কিন্তু আমিও কম কষ্ট পাইনি। কম বিপদের সম্মুখীন হইনি। একজন মোটামুটি সুশ্রী যুবতীর যে কতরকমের বিপদের মধ্যে দিয়ে পথ চলতে হয় তা তোমরা পুরুষেরা কখনওই জানবে না। হয়তো জানতে চাও-ও না।

কাকাকে কি একদিন আপনার কাছে নিয়ে আসব? খুঁটি থেকে ট্যাক্সি নিয়ে গিয়ে নিয়ে আসব।

না তমাল। তুমি নিয়ে এলেও আমি দেখা করব না। যে মানুষটাকে অত কাছ থেকে, সুস্থতার প্রতিমূর্তি হিসেবে দেখেছি তাকে আমি পাগল হিসেবে দেখতে পারব না। আমি এখনও এক স্বপ্নের মধ্যে দিন কাটাই। আমার বেডরুমে তোমার কাকার একটি ছবি আছে—লাইব্রেরির বারান্দাতে সে দাঁড়িয়ে আছে তার খুব প্রিয় একটি হলুদ-রঙা ফুলহাতা জামা আর সাদা ফুলপ্যান্ট পরে। ছবিটিকে আমি এনলার্জ করে নিয়েছি। ছোট প্রিন্টও আছে। আমার হাত ব্যাগের মধ্যে থাকে।

বলে, মুখ নামিয়ে নিলেন।

তারপরে বললেন, কাকা যদি কখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যান তখনই নিয়ে এস তাঁকে আমার কাছে।

তখন আনলে কী হবে?

কী হবে, তা ভবিষ্যৎই জানে।

আপনার একটি ছবি কি আমাকে দিতে পারেন কাকার জন্যে।

অমন ভুল কখনও কর না। আমি তো নার্সই ছিলাম। মনোরুগির চিকিৎসাও আমি করেছি অনেক। কত ফাদারদের মাথার গোলমাল হয়েছে। যার মাথার ঠিক নেই তাকে বর্তমানেই থাকতে দিতে হয়, অতীতকে তার সামনে ভুলেও আনতে নেই। তাতে তার পাগলামি মারাত্মক রকম বেড়ে যেতে পারে। না, না, তাঁকে আনার কথা একেবারেই চিন্তা কোরো না। যদি পারি, আমিই একদিনে গিয়ে দূর থেকে তাঁকে দেখে আসব। খুব সম্ভব তিনি আমাকে চিনতে পারবেন না। সেটাই বাঁচোয়া চিনতে পারলে অনর্থ হবে।

তারপর বললেন, তুমি নিজে না আসতে পার, মাঝে মাঝে লোক পাঠিয়ে খবর নিও এবং দিও-ও। তোমার তো অনেকই লোকজন আছে।

আপনার ফোন নেই?

—না, নেই। তবে এখানে টাওয়ার বসছে শুনছি। বসলে, একটা মোবাইল ফোন নেব। নাও নিতে পারি। আমার কী দরকার। এসব কিছুই মানুষের শান্তি নষ্ট করে। এতগুলো দিন তো চমৎকার কেটে গেল। ওসব বিনা কারণের উৎপাত দিয়ে কী হবে। তুমি জেনে নিও, একদিন এসবের উপকারিতার চেয়ে অপকারিতা যে কত বেশি তা মানুষ শিগগিরই বুঝতে পারবে। এসব যন্ত্র ভালোমানুষের চেয়ে চোর-ডাকাতেরই বেশি দরকার।

তারপরই বললেন, প্রচণ্ড বৃষ্টি আসছে। গামহারডুংরী পৌঁছতে ভিজে একশা হবে। একটা ছাতা দিয়ে দেব কি?

ছাতা উল্টে যাবে। আপনি তো জানেন। বৃষ্টির সঙ্গে যা জোর হাওয়া থাকে। আমাদের অভ্যেস আছে।

—তা তো জানিই। সঙ্গে টর্চ এনেছ তো। বর্ষার দিন। সাপখোপ আছে। বিছে আছে।

—না আনিনি। এত দেরি হবে বুঝতে পারিনি।

—আমার কাছে এক্সট্রা টর্চ আছে। নিয়ে যাও। পরে পাঠিয়ে দিও। যে আসবে সে যেন তোমার কাকার খবরটাও নিয়ে আসে। তুমি এখান থেকে ট্যাক্সি নিয়েও যেতে পারো।

—নাঃ। টাকা তো আমার নিজের নয়। একটি ফ্রেঞ্চ ট্রাস্ট এর টাকা অপচয় করা অনুচিত।

—তুমি দেখেছি তোমার কাকারই মতো স্বভাব পেয়েছ।

—উনি ভিতর থেকে একটি তিন ব্যাটারির টর্চ নিয়ে এলেন, ব্যাটারি ভরা। .

তমাল উঠল।

মরিয়ম বারান্দাতে এসে দাঁড়াল। বেচারি। সেজেগুজে রইল রাই এইলগনে বিয়া নাই।

ইসাবেলা হাসলেন, মরিয়মের দিকে অপাঙ্গে চেয়ে বললেন, আজকে আর হাটে যাওয়া হবে না। বসবেই না হাট।

মরিয়ম প্রায় কেঁদে ফেলবে মনে হল।

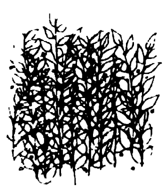
ইসাবেলা হেসে বললেন. তুই যদি যেতেই না পারিস তবে সে এসে হাজির হবে। এলে, ওমলেট আর চা করে দিস।

মরিয়মের মুখটি কান্না থেকে এক আশ্চর্য হাসিতে উদ্ভাসিত হল।

তমাল ইসাবেলাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে ইসাবেলা তার থুতনি ধরে তাকে আদর করে দিলেন।

তমাল ভাবছিল, এমন একজন কাকিমার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হল সে এ জীবনে। মরিয়ম মেম সাহেবের মতো আপাদমস্তক মেয়েলি মেয়ে সম্ভবত এ জীবনে সে আর দেখেনি।

ভাবছিল তমাল।



●

আজকে পূর্ণিমা। রুপোর থালার মতো চাঁদ উঠেছে। সমস্ত গামহারডুংরী, নীচের নতুন টাঁড়, তাজনা নদী রুপোঝুরি হয়ে গেছে। মোহময় হয়ে উঠেছে দশদিক। একটু আগেই গৈরিকা গান গেয়েছিল 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে উছলে পড়ে আলো, ফুলের বনে যার পাশে যাই তারেই লাগে ভালো।'

তমাল ভাবছিল, এত কিছু 'ক্লিশে' হয়ে যায় শুধু রবীন্দ্রসংগীতই হয় না। কী যে সঞ্জীবনী সুধা আছে রবীন্দ্রনাথের গানে! যারা জানল না, তারা বড় অভাগা। গৈরিকার গানের পরে মুনরী, মুন্ডারি গান ধরল। বিরসা মুন্ডার প্রশাস্তির গান।

'রাঁচী জেলা উড়নি উলুহাতুরে জনম লেনা

আটামাটা বিকোথালা মুসিয়া চালেকাদ হাতুরে হারামোতে লেনা কুন্দরুগুটুরে বিরসা ডেরা লেনা মোছিয়া চালকার হারামোতারে ডোম্বারিবুডুরে উপর লেনা বিরসা

বান্দুকো গুলি লোবেন বিরসা দাগ গিরি কিদী

হাগামাসি ইয়ারি রিসাকো রাসিকাতানা...'

মুনরী গান গাইছিল। বিশাল কাকা আর ওদের সকলের সামনে। আজও বৃষ্টি হয়েছে তবে তমালদা যেদিন খুঁটিতে গেছিল সেদিনের মতো নয়। নীচে সাইকলে রেখে রাত প্রায় সাড়ে আটটাতে একেবারে চুপচুপে হয়ে ভিজে এসে উঠেছিল গামহারডুংরীতে। বলছিল, হাতে টর্চ ছিল তাই বেঁচে গেছে। বৃষ্টির মধ্যে দু-দুটি সাপ পেয়েছিল পথে। কী সাপ জানে না তা তমাল কিন্তু দুটিই এঁকেবেঁকে যাচ্ছিল। জিম

করবেটের লেখাতে ছেলেবেলাতে পড়েছিল যে, যেসব সাপ এঁকেবেঁকে যায়, তারা বিষধর আর যারা সোজা হয়ে যায় তারা নির্বিষ।

বুধাই আর ঝিরিকে এসেই বলেছিল পরদিনই গ্যামাক্সিন আর কার্বলিক অ্যাসিড ছড়িয়ে দিতে হবে ডুংরীতে এবং নতুন 'টাঁড়েও'। খুঁটি থেকে নিয়ে আসবে বেশি করে। নিয়ে আসবে রেবতী। রেবতীর হাতেই সিস্টার ইসাবেলার টর্চটা আর কিছু ফুল, যা এখানে হয়, পাঠিয়ে দেবে তাঁকে। বলেছিল পরদিনই, কিন্তু যেতে পাঁচ-ছদিন পেরিয়ে গেছে। নানা কাজে ব্যস্ত থাকাতে যেতে পারেনি রেবতী।

এবারে গান তো গাইলি মুনরী, মানেটা কী হল? আমরা কি তোদের ভাষা বুঝি?

পাখি বলল।

ওরা সবাই সন্ধের পরে সেদিনের মতো বাইরে বসেছিল। কাকার জন্যে কাঠের চেয়ারটি এনে দিয়েছে বুধাইরা তমালদার ঘরের বারান্দা থেকে।

কাকা বললেন, মানে, আমি বলে দিচ্ছি : রাঁচী জেলার উড়নি উলুহাযু গ্রামে জন্মেছিল তুমি, ভগবান বিরসা। গভীর জঙ্গলের মধ্যের গ্রাম মুসিয়াচালেকাদে বড় হয়েছিলে তুমি। তারপর কুন্দ্রুগুটু গ্রামে তুমি বাসা বেঁধেছিলে। ডোম্বারিবুড়ু পাহাড়ে চড়ে গেলে তুমি ভগবান বিরসা ইংরেজদের মোকাবিলা করতে। তারা যখন তোমার ও'পরে বন্দুক দিয়ে গুলি চালিয়েছিল তখন সেই সিসের গুলি জল হয়ে গেছিল। তাতে মুন্ডারা কত যে খুশি হয়েছিল।

পাখি বলল, মুনরীকে, তুমি যে বললে বিরসা মুন্ডার মন্দির সুকানবুড়ু পাহাড়ে?

হ্যাঁ তো। সেই পাহাড়েই বিরসা মুন্ডার মন্দির হয়েছে কিন্তু বিরসা ভগবান ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ তো করেছিলেন ডোম্বারিবুড়ু পাহাড়েই।

ঋদ্ধি বলল, তা, সে পাহাড়টা কোথায়?

ডোম্বারিবুড়ু পাহাড়ও খুঁটি থেকে সাইকো যাওয়ার পথেই পড়ে।

কাকা বলছিলেন, এরা যে কত গরিব তা দীর্ঘদিন জঙ্গলে থেকেছি বলেই জেনেছি। ফাল্গুন মাস থেকে একরকমের গোল গোল হলুদ রঙা ফল হয়, তার নাম কিঁওন্দ। খেতে মিষ্টি, পেয়ারার মতো, তাই এরা তুলে এনে খায়। একরকমের গাছ হয় লম্বা লম্বা পাতা, গাছও লম্বা লম্বা, নাম ভেলোয়া। কালো গোল গোল ফল হয় সেই গাছে। একদিকে বীচি থাকে, শাঁস আলাদা। এই সময়েই চাঁরও হয়। চিরাঞ্জিদানা, মস্ত মস্ত গাছ। সেই দানা গোল গোল সবুজ থাকে কাঁচা অবস্থাতে, পেকে গেলে কালো হয়ে যায়।

ওরা বুনো ডুমুরও খায়—কাঁচা অবস্থায় সবুজ থাকে, পাকলে লাল হয়ে যায়। কুসুম ফলও খায় এই সময়ে, হলুদ রঙের ফল, টক মিষ্টি। বীচিগুলো বাজারে পাইকারদের কাছে বিক্রি করে দেয়। তারা সেই বীচি থেকে তেল বের করে। কুসুমের তেল, গায়ে মাথায়ও মাখে আবার রান্নার জন্যেও ব্যবহার করে এরা। নিমেরও তেল হয়, করৌঞ্জের তেলও। মেয়েরা মুখে মাখে। তারপর পাকে মহুয়া। ওদের দুঃখ দিনের সাহারা। মহুয়া শুকিয়ে রাখে ওরা। সেঁকে খায়, ভেজে খায়, রুটি করে খায়। সেদ্ধ করেও খায়। মহুয়ার মদও তৈরি করে।

সবুজ গোল গোল শালগাছের ফলও সেদ্ধ করে শুকিয়ে রাখে। এই সবই ওদের staple food—সারা বছরের। বাজরা বা মাড়ুয়া খুব কমই খেতে পায় এরা। আর ভাত? সে তো অমৃত। শুধুমাত্র বিয়ে টিয়ে হলেই খেতে পায় শুয়োরের মাংস ও মহুয়ার মদ দিয়ে।

এটুকু বলেই কাকা চেঁচিয়ে বললেন, কেরে শালা মূয়া ভুত? আমাকে চেনো না? আমি খুঁটির বিশাল বাবু। আনতোরে তমু তোর রাইফেলটা গুলি করে ফর্দা-ফাঁই করে দিচ্ছি।

তমালদা তাঁর ঘরে ছিলেন। লণ্ঠনের আলোয় কী সব হিসেব-পত্তর করছিলেন।

কাকা হঠাৎ বললেন, আমার মাথার মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। আমি ঘরে যাব।

তমালদার ইন্সট্রাকশানই ছিল যে কাকার এমন অবস্থা হলেই ঋদ্ধিই তাঁকে ওষুধ খাওয়াবে। কিন্তু কাকা হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠেই, অন্যরা কিছু বোঝার আগে পাখির হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান মেরে ওকে টেনে নিয়ে গেলেন ওঁর ঘরে। ঘরে নিয়ে গিয়েই একটানে পাখির পাতলা ব্লাউজটা এবং ব্রেসিয়ারটাও ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, ইসাবেলা। ইসাবেলা। তোমার বাঁদিকের বুকে তিনটে বড় বড় লাল তিল ছিল, দেখি তো আছে কি না, না, কোনো শালা খেয়ে ফেলেছে।

পাখি বেচারা আতঙ্কে কেঁদে উঠে কোনোক্রমে কাকার হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে ঋদ্ধির পাশ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল, শাড়ি দিয়ে বুক ঢেকে।

তমাল দৌড়ে এসে বলল ঋদ্ধিকে, ডাবল ডোজ দে, ডাবল ডোজ দে।

পাখি মেয়েদের ঘরে চলে গেছিল। অন্য মেয়েরাও, মুনরী শুদ্ধ ওর পিছু পিছু সে ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল পাখি।

তমাল আর ঋদ্ধি কাকাকে ডাবল ডোজ ঘুমের ওষুধ দিয়ে দরজাটাতে বাইরে থেকে হুড়কো দিয়ে ঘরের বাইরে এল। এসে তমাল মেয়েদের ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে বলল, পাখি, আমি কাল পরশুই কাকাকে রাঁচীতে নিয়ে গিয়ে আবার ভর্তি করে দিচ্ছি। আমি খুবই লজ্জিত। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও। প্লিজ ক্ষমা করে দিও।

পাখি এতটাই হকচকিয়ে গেছিল যে কিছুই বলতে পারল না তমালকে।

কিছুক্ষণ পরে মুখে-চোখে জল দিয়ে পাখি বাইরে এল অন্যদের সঙ্গে। নিচু গলাতে বলল, আমি খুবই ভয় পেয়েছিলাম ঠিকই কিন্তু

উনি তো আমার সঙ্গে তেমন অসভ্যতা কিছু করেননি।

একটু চুপ করে থেকে বলল, তাছাড়া, তমুদা, উনি তো আমারও নিজের কাকা হতে পারতেন। একজন অসুস্থ মানুষের উপরে রাগ করবেন না। আপনি ছাড়া তাঁর তো আর কেউ নেইও।

নেই কেন? তাঁর ইসাবেলা আছেন। তিনি তো পাগলের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করলেন। জীবনে পিছন ফিরে আর কে তাকাতে চায় পাখি। সকলেরই চোখ সামনের দিকেই।

ওরা সকলেই চুপ করে রইল।

বুধাই এসে বলল, খিচুড়ি হয়ে গেছে বাবু। গরম গরম আলু আর কাঁঠালের বীচি ভেজে দেব। আপনারা দশ মিনিট পরে আসুন।

খিচুড়ি-বিশারদ রুরু জিজ্ঞেস করল, কী ডালের খিচুড়ি?

অড়হর আর মুসুরি মেশানো।

কটা শুকনো লংকা ভাজা।

রেবতী বলল, কটা কাঁচালঙ্কাও। কাকার খাওয়ার বুধাই ঘরে নিয়ে গেল বটে কিন্তু ফিরে এসে বলল, কাকাবাবু অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। ঘুম ভাঙিয়ে খাওয়াব কি?

পাখি বলল, পেটে খাবার পড়লে কিন্তু ঘুম আরও ভালো হত।

বলেই বলল, বুধাইকে, চল বুধাই, আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।

—তুমি যাবে পাখি?

অবাক গলাতে বলল, তমাল।

হ্যাঁ যাই। ওঁর মনে যদি কোনো অপরাধবোধ জেগে থাকে তাহলে আমাকে দেখলে কেটে যাবে। মনোরুগিদের পক্ষে কোনোরকম অপরাধবোধই ভালো নয়।

তমাল কিছু বলল না মুখে। তবে ভাবছিল, ওই গামহারডুংরীতে এতজন সাইকোঅ্যানালিস্ট এর সমাহার হয়েছে যে তা জানা ছিল না। সকলেই দেখছে মনোরোগ সম্বন্ধে কিছু না কিছু জানে। সম্ভবত

তাদের ওই অকৃপণ জ্ঞানটাই এক মনোরোগ।

পাখি বিশাল কাকার ঘরে গিয়ে প্রথমে তাকে আস্তে আস্তে ডাকল, পরপর তাঁর বুকে হাত বুলিয়ে ডাকল। মিনিট পাঁচেক পরেই কাকা হঠাৎ চমকে উঠে বিছানার উপরে উঠে বসলেন। বসেই, সামনে পাখিকে দেখেই উবু হয়ে পাখির হাঁটুর উপরে মাথা দিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

ব্যাপারটা এতই তাড়াতাড়ি ঘটল এবং এমনই অভাবনীয়ভাবে যে, ওঁর কান্না দেখে পাখিও কেঁদে ফেলল। তারপর বুধাই আর পাখি দুজনে মিলে ওঁকে উঠে বসাল।

.পাখি বলল, খিচুড়িটা গরম আছে। খেয়ে নিন কাকা। বিকেলে তো এককাপ চা আর দুটো পাঁপড়ভাজা ছাড়া কিছু খাননি।

কাকা ঘোরের মধ্যে, পাখির দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। পাখিই প্লেট থেকে চামচে করে তুলে তাঁকে খিচুড়িটা খাইয়ে দিল। ঋদ্ধিও ঘরে এল। খাওয়ার পরে যে-সব ওষুধ ছিল তা ও আর বুধাই কাকাকে খাইয়ে দিল। তারপর জলের জাগ আর গ্লাস রেখে দিল টেবিলের উপরে। ওঁর বালিশের পাশে টর্চটা রেখে বলল, রাতে বাইরে গেলে টর্চটা নিয়ে যাবেন।

এই ঘরের সঙ্গে অ্যাটাচড বাথ নেই। দুটি বাথরুম। একটি মেয়েরা ব্যবহার করে, অন্যটি পুরুষেরা।

ঋদ্ধি বলল, অবশ্য পূর্ণিমার চাঁদ আছে।

কাকা জড়ানো গলাতে বললেন, চাঁদ কখন মেঘে ঢেকে যায়, কে বলতে পারে।

পাখি ভাবছিল, কাকা খুব দামি একটা কথা বলেছেন। এই বাক্যটা প্রত্যেকের জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই অমোঘভাবে প্রযোজ্য। সত্যিই তো! চাঁদ কখন মেঘে ঢেকে যায়, কে বলতে পারে!

পাখি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পায়জামা আর হাতকাটা গেঞ্জি

লেগে রইল। গন্ধটা পুরোপুরি পুরুষালি। পাখির বাবা ছেলেবেলাতে মারা গেছেন। তাদের বাড়িতে কোনো পুরুষ নেই। এই গন্ধটার সঙ্গে সে পরিচিত ছিল না। গন্ধটা সুগন্ধ নয়। কিন্তু বুনো ফুলের গন্ধেরই মতো সে গন্ধে এক মাদকতা আছে।

ঋদ্ধি বলল, কাকা, ওষুধগুলো সব রইল টেবিলের উপরে। কাল সকালে নাস্তা খাওয়ার আগে আমি আসব। নাস্তার আগে ও পরে অনেকগুলো ওষুধ খেতে হবে।

ফেলে দে সব।

কাকা বললেন।

—আমি আর ওষুধ খাব না।

—সেকি? কেন?

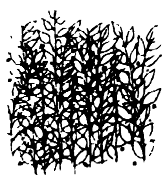
শালা তোদের গাণ্ডুদের দেশে জীবনদায়িনী ওষুধেও ভেজাল, প্রাণঘাতিনী ওষুধেও ভেজাল।

—না, না। ওষুধ না খেলে চলবে কেন?

বলছি খাব না। কোনো ওষুধেই আর আমার দরকার নেই রে গাণ্ডু। এবারে কেটে পড়। ঘুমোতে দে আমাকে। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে।

—যাচ্ছি। ভালো করে ঘুমোন।

—হয়েছে। তোর আর পিসিমাগিরি করতে হবে না রে গাণ্ডু। যা, এবারে ভাগ।



●

সূর্য ওঠার আগেই ঝিরি অনেকরকম ফুল তুলে দিয়েছিল রেবতীকে। টর্চ আর ফুলগুলো নিয়ে ইসাবেলা মেমসাহেবকে দেওয়ার জন্যে ও সাতসকালেই বেরিয়ে পড়েছিল। তাজনার ধারের মিন্নুর চায়ের দোকানে এক ভাঁড় চা খেয়ে সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়বে বানিয়া চম্পালালের দোকানের উদ্দেশে। সেখান থেকে বাস ধরে খুঁটিতে যাবে। খুঁটিতে কার্বলিক অ্যাসিড আর গ্যামাক্সিন কিনে দুপুরে কোনো হোটেলে খেয়ে নিয়ে বিকেলে ওখান থেকেই কুন্দ্রগুটু হাটে যাবে। কুন্দ্রগুটু খুঁটি আর মুরহুর মধ্যে পড়ে। ওরা সকলেই আজ কুন্দ্রুগুটুর হাটে আসবে গামহারডুংরী থেকে।

গামহারডুংরীতে ঋদ্ধি, কাকার ঘরে গিয়ে পৌঁছাল বুধাই এর সঙ্গে। বুধাই এর হাতে স্টেইনলেস স্টিলের থালা আর বাটিতে রুটি আর আলুর তরকারি—সকালের নাস্তা। চা পরে নিয়ে আসবে। কিন্তু গিয়ে দেখল, ঘর খালি। তখন সকাল প্রায় আটটা।

কোথায় গেলেন কাকা?

মুহূর্তের মধ্যে খবরটা পুরো গামহারডুংরীতে ছড়িয়ে পড়ল।

কাকাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

ছেলেমেয়েরা এবং কাজের মানুষেরা সকলেই যে যেদিকে পারল খুঁজতে বেরল। রেবতী তো বেরিয়েই গেছে সাতসকালে খুঁটির দিকে। গামহারডুংরীর মালভূমির বিস্তার তো কম নয়। কম করে আধ বর্গ কিমি হবে। আমলকী গাছগুলো যখন বড় হবে, যখন ফল আসবে গাছগুলোতে, তখন চিতল হরিণ খেলে বেড়াবে তার তলাতে।

হরিণেরা আমলকী খুব ভালোবেসে খায়। আর খায়, শিমুলের ফুল। শিমুল খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে বলে তারা ইতিমধ্যেই বড় হয়ে গেছে। চোত-বোশেখে গাছের তলাতে ফুলের গালচে বিছিয়ে দেন প্রকৃতি। এখন হরিণেরা কবে আসবে তারই প্রতীক্ষা। ফুটকি হরিণের চেয়ে শিমুল ফুল খেতে বেশি ভালোবাসে লাল-রঙা ছোট ছোট কোটরা হরিণগুলো, যারা অ্যালসেশিয়ানের মতো ডাকে পাহাড় চমকিয়ে ব্বাক ব্বাক ব্বাক করে। তারা কবে আসবে কে জানে। এই প্রকৃতির মধ্যে নানা প্রাণ ও প্রাণীর আসা-যাওয়ার সব রহস্যের কথা প্রকৃতিই জানে। তিনিই এইসব প্রাণ জাগান, তিনিই ঘুম পাড়ান, তিনিই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে তাদের অদৃশ্য থেকে চালিত করেন। তাঁর এই লীলাখেলা না যায় দেখা, না বোঝা।

তমাল তার কাকাকে খুঁজে চলে পাগলের মতো। তার একমাত্র পূর্বসূরী, পণ্ডিত, ভালোমানুষ, সিস্টার ইসাবেলার প্রেমিক বিশাল কাকা।

একেক জনে একেক দিকে গেছে।

বুধাই এর চান হয়ে গেছে। সেই অশ্বত্থগাছের বনদেওতার থানে ভোরের পুজোও সে চড়িয়ে এসেছে। তাজনা নদীও দর্শন করেছে সূর্যোদয়ের সময়ে। ওদিকে আর গিয়ে লাভ নেই কারণ ওদিক দিয়ে নয়া-টাঁড়ে নামা যাবে না—একেবারে খাড়া। তাই কাকাবাবুর ওদিকে যাওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই। তবুও ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পৌঁছে গেল বুধাই আর পৌঁছে গিয়েই চমকে উঠল কাকাবাবুকে অশ্বত্থ তলাতে পড়ে থাকতে দেখে। সাপে কামড়েছে তাঁকে। বেশ অনেকক্ষণ আগেই কামড়েছে। মুখে গ্যাঁজলা উঠে গেছে। শরীরেও সাড় নেই।

রুরু পিচ রাস্তাতে পৌঁছেও ট্যাক্সি পেল না। পাওয়ার কথাও নয়। বন্দগাঁও থেকে কখনও ট্যাক্সি আসে অথবা চক্রধরপুর থেকে ফাঁকা,

কিংবা যাত্রী নিয়ে খুঁটিতে যায়। কিন্তু সেদিন কোনো ট্যাক্সির দেখা পেল না। অনেক পরে খুঁটিতে পৌঁছে সব ওষুধের দোকানে খোঁজ করে জানল যে তাদের কাছে সাপে কামড়ানোর ওষুধ নেই কোনো।

তারা মিশনের হাসপাতালে খোঁজ করতে বলল। ইতিমধ্যে দেড় দু'ঘণ্টা সময় পেরিয়ে গেছে। মিশনের হাসপাতালে গিয়ে বিশাল কাকার নাম বলেও চেষ্টা করল। তাঁরা বললেন, এখন খুব ভালো ওষুধ বেরিয়েছে, পাউডারের মতো। কিন্তু ওষুধ শেষ হয়ে গেছে। রাঁচীতে অর্ডার দেওয়া হয়েছে। হয়তো দু'একদিনের মধ্যেই এসে যাবে।

অসহায়ের মতো হাত কামড়াতে কামড়াতে একটা রিকশা নিয়ে সিস্টার ইসাবেলার বাড়িতে পৌঁছলো যখন রুরু তখন শুনল তিনি চার্চ এ গেছেন উপাসনা করতে। সেদিন রবিবার ছিল। সেখান থেকে চার্চে পৌঁছাল। তখন রবিবারের 'মাস' শেষ হচ্ছে। রুরু তো তাঁকে চেনে না। একে ওকে জিজ্ঞেস করতে লাগল চার্চ এর সামনে দাঁড়িয়ে। একেবারে শেষে সিস্টার ইসাবেলা বেরোলেন চার্চ থেকে। রুরু তার পরিচয় দিয়ে অঘটনের কথা জানাল। উনি পাথরের মতো শক্ত হয়ে সব শুনলেন। তারপর ওকে বললেন, তুমি চলে যাও। আমি যাচ্ছি একটু পরে ট্যাক্সি নিয়ে। তুমিও ট্যাক্সি করেই ফিরে যাও। টাকা আছে তো?

হ্যাঁ। আছে টাকা। তমালদা দিয়ে দিয়েছেন।

তবে যাও। তোমাকে তমালের দরকার হতে পারে। আমি গিয়ে ওঁকে দেখা ছাড়া তো আর কিছু করতে পারব না। তাঁকে এমনভাবে দেখার কোনো মানেও হয় না। গিয়ে কী হবে তাই ভাবছি। আমি হয়তো নাও যেতে পারি। উনি ভালো হন আর না হন তমালকে বোলো কাল একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে। যাও তুমি দেরি কোরো না।

রুরু ভদ্রমহিলাকে দেখে যেমন মুগ্ধ হয়েছিল তেমনই তাঁর ওই রকম শীতল প্রতিক্রিয়া দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল। ও জানে না, তমালদাকে গিয়ে কী বলবে!

ওদিকে বুধাই তাজনা বস্তিতে গিয়ে একজন ভগতকে ধরে নিয়ে এসেছিল। যদি ঝাড়ফুঁক করে কাকাবাবুকে সে বাঁচাতে পারে। ভগত বাড়ি ছিল না, তার মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে গেছিল সাইকোতে। তার বাড়ির লোকেরা বলল, গেছে অনেকক্ষণ, এসে যাবে এগারোটার মধ্যে। ভগতের জন্যে বসে রইল বুধাই। সে এলে, তাকে নিয়ে এল গামহারডুংরীতে। ভগত এসে নাড়ি দেখে বলল, উনি তো কম করে দু-তিন ঘণ্টা আগেই মারা গেছেন। আমার করার আর কিছুই নেই।

বিশাল কাকার ঘরের বাইরে, কাঠের চেয়ারটাতে বসেছিল তমাল। ছেলেমেয়েরা, যারা ছিল এখানে ওখানে ডাল-ভাঙা পাখির মতো বসেছিল ওর তিনদিকে।

তমাল ভাবছিল, কাকা ঠিকই বলতেন। স্বাধীন ভারত সত্যিই গাণ্ডুদের দেশ। এখানে মানুষ, যে ঈশ্বর ও নিজে বিশ্বাস করে না, সেই ঈশ্বরের দয়াতেই বেঁচে থাকে। ওষুধে ভেজাল, সাপের কামড়ের ওষুধ এই রকম জঙ্গুলে জায়গাতেও পাওয়া যায় না, যেখানে সাপে রোজই কামড়াতে পারে মানুষকে, এবং কামড়ায়ও। যখন চাঁদে আর মঙ্গলগ্রহে মানুষ হাঁটছে, বিশ্বায়ন হচ্ছে দিকে দিকে, স্টক এক্সচেঞ্জের ইনডেক্স উঠছে উল্কার মতো, নানা দেশ থেকে শিল্পপতিরা এসে এদেশে শিল্প গড়ছেন নতুন নতুন, কেমিক্যাল হাব হচ্ছে, পেট্রোকেমিক্যালের কারখানা, মেট্রো রেইল, সেই দেশ-এরই প্রদীপের নীচে এত অন্ধকার। এই উন্নতির মধ্যে কোনো সাম্য নেই। শিশুর যেমন সুষম খাদ্যের দরকার, দেশের এইসব ক্রিয়াকাণ্ডও সুষম হওয়া দরকার।

পাখি বলল, কাউকে খবর দেওয়ার আছে তমালদা?

—নেই। থাকলেও, খবর রাঁচীতে পাঠাতে পাঠাতে তো সন্ধে হয়ে যাবে। যাকে খবর দেওয়ার ছিল তাকে খবর দেওয়ার জন্যে তো পাঠিয়েছি রুরুকে খুঁটিতে।

বলতে বলতেই রুরু এসে পৌঁছাল ঝোড়োকাকের মতো।

সব শুনে তমাল বলল, বুধাই, শবদাহ কোথায় করা হবে?

তাজনা নদীর পারেই করব আমরা। চাঁদ শ্মশানে। আমরা মুণ্ডারা তো সব দাহ করি না, মৃতদেহ কবর দিই। তবে কখনও সখনও দাহও করি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে।

কাকাকে কবরই দেব না কি?

তমাল সবাইকে জিগগেস করল।

আমাদের সাসানডিরিতে তো দিকুদের কবর দেওয়া যাবে না বাবু। মুরহুর কাছে আমাদের একটি সাসানডিরি আছে।

আমরা তো গামহারডুংরীতেই করব দিতে পারি কাকাবাবুকে। গামহার গাছেদের নীচে।

ছেলেমেয়েরা বলল, আমরা যখন হিন্দু তখন দাহ করাই উচিত।

—আমি ধর্ম মানি না। তোমরা যা ভালো মনে করো, করো।

বাঁশের তৈরি একটি স্ট্রেচারে বিশাল কাকাকে নিয়ে ওরা ধরাধরি করে যখন তাজনা নদীর পারে পৌঁছাল তখন বিকেল হয়ে গেছে। ভাই-ফোঁটাতে পাওয়া একটি নতুন ধুতি ছিল রুরুর কাছে, সেইটা ছেলেরা মিলে পরিয়ে দিয়েছিল কাকাবাবুকে। ঋদ্ধির কাছে সিল্কের একটি নতুন চাদর ছিল। সেটি গায়ে দিয়ে দেওয়া হল। ঝাঝাকে পাঠানো হয়েছিল তাজনা বস্তিতে ঘি আর কাঠ জোগাড় করতে। সবকিছু আয়োজন সম্পূর্ণ করে শবদেহ বয়ে ডুংরী থেকে নীচে নামিয়ে নিয়ে, যখন তমাল এবং ছেলেমেয়েরা সকলেই কাকার মুখে আগুন দিল, পাটকাঠির অভাবে গাছের সরু ডাল দিয়ে, তখন দিনান্তবেলার শেষ আলো তাজনার বুক লাল করে দিয়েছে।

চিতা যখন ধরে গেছে, দাউ দাউ করে লেলিহান শিখা বড় দুঃখী মানুষটাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলছে, তখন খুব ধীরগতিতে একটি ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল তাজনার পাড়ে। ট্যাক্সি থেকে সিস্টার ইসাবেলা আর মরিয়ম নামলেন।

তমাল গিয়ে তাঁর দু'হাত ধরল।

ওঁকে দেখে ছেলেমেয়েরাও সকলেই ওঁর কাছে এগিয়ে গেল।

তমাল বলল, ওরা সবাই আপনার কথা জানে। আমি তো কাকার ভাইপোই কিন্তু এরা সকলেই তাঁকে পরম আপনজন বলে গ্রহণ করেছিল। এবং আপনাকেও করেছে।

সিস্টার ইসাবেলার দু'চোখ জলে ভরে এল। অস্ফুটে তিনি বললেন, বড় দেরি হয়ে গেল। বড়ই দেরি হয়ে গেল।

তমাল ভাবছিল, জীবনে যাওয়া অথবা আসা, বা অন্য অনেক কিছুই সময়সীমার মধ্যে না হলে তার আর কোনো মানে থাকে না। তা সম্পূর্ণই অর্থহীন হয়ে যায়।

হালকা হলুদরঙা একটি সালোয়ার-কামিজ পরে পাখি সজল চোখে চেয়েছিল বিশাল কাকার জ্বলন্ত চিতার দিকে।

ও ভাবছিল, সিস্টার ইসাবেলার ডান বুকে সত্যিই কি তিনটি লাল তিল আছে?

তমাল ঠিক করল, আর দেরি করবে না, আগামিকালই বলবে পাখিকে, যা বলার।